মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তগণ বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিগণের গ্রন্থসমূহ পেটিকার মধ্যে করিয়া গো-শকটে মল্লভূমরাজ্যের মধ্য দিয়া গৌড়ে লইয়া আসিতেছিলেন। রাজ জ্যোতিষীর গণনামত পেটিকাগুলির মধ্যে ধনরত্ন আছে মনে করিয়া বীর হাম্বীর তাঁহার লোকজন দিয়া উহা লুণ্ঠন করিয়া আনান। পুঁথিগুলির উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তি ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ মল্লভূমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। অনেকেই বোধ হয় জানেন, কলিকাতার বাগবাজারে যে মদনমোহন ঠাকুর আছেন, তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবতা। মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ ইংরেজ আদালতে মোকদ্দমার খরচ সংগ্রহের জন্য এই বিগ্রহটিকে বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী গোকুলমিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যবাসী প্রত্যেককেই প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ করিতে হইবে, ইহা যে না করিবে সে শাস্তি পাইবে। এই কার্য্যকে লোকে "গোপাল সিংহের বেগার" আখ্যা দিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাহারাষ্ট্রা বা বর্গীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ও গৃহবিবাদের ফলে মল্লরাজ্যের পতন হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মল্লভূম বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট বিক্রীত হয়।

বিষ্ণুপুরে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের গড়খাই, পাথর দরজা ও বীর দরজা নামক প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গদ্বার, প্রসিদ্ধ "দলমর্দ্দন" বা "দলমাদল" কামান, মল্লেশ্বর, মদনগোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামরায় ও রাধাশ্যামের মন্দির, জোড়বাংলা, রাসমঞ্চ, পঞ্চরত্ন মন্দির; লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও কালিন্দীবাঁধ, প্রভৃতি নামধেয় বাঁধ বা প্রকাণ্ড জলাশয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। বস্তুতঃ বিষ্ণুপুর প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র।

বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত দলমাদল কামানটির দৈর্ঘ ১২ ফুট ৫।। ইঞ্চি ও পরিধি ১১।। ইঞ্চি। গঠনে ইহা বিজাপুরের সুপ্রসিদ্ধ কামান "মালিক-ই-ময়দান" এর অনুরূপ। ইহা এরূপ লৌহের দ্বারা প্রস্তুত যে আজ পর্য্যন্ত ইহার কোথাও একটু মরিচা ধরে নাই। ইহাতে স্বতঃই দিল্লীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভের কথা মনে হয়। বর্ত্তমানে এই কামানটি সরকারের রক্ষিত কীর্ত্তির অন্তর্গত। ইহার গায়ে ফার্সিতে একটি লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে এই কামানটি প্রস্তুত করিতে একলক্ষ পচিশ হাজার টাকা লাগিয়াছিল। প্রবাদ যে মাহারাষ্ট্রা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মদনমোহন দেব দলমাদল কামান দাগিয়া শত্রুসৈন্যকে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ও জোড়বাংলা মন্দিরের গাত্রে ইষ্টকের উপর যে সকল দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে তাহা শিল্পসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। জোড়বাংলার গাত্রে একটি সুন্দর নৌ-যুদ্ধের চিত্র আছে। উহা যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বোরোবুদুর মন্দির গাত্রের চিত্রাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

লালবাঁধ পুষ্করিণী সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বরদার বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত লালবাঈ নামে একটি অতি সুন্দরী মুসলমান রমণীকে লইয়া আসেন। লালবাঈএর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র মহাল

নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নামানুসারে "লালবাঁধ" নাম রাখেন। লালবাঈএর অনুরোধে রাজা ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে প্রধানা মহিষী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া মন্ত্রী গোপাল সিংহ প্রভৃতির সহায়তায় তাঁহাকে হত্যা করান। লালবাঈকে লালবাঁধে ডুবাইয়া মারা হয়। অতঃপর প্রধানা মহিষী রাজার চিতায় আরোহণ করিয়া "সতী" হন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে "পতিঘাতিনী সতী" নামে অভিহিত করে। লালবাঈ রাজ্যশুদ্ধ লোক সমেত রাজাকে যে স্থানে মুসলমানী খানা খাওয়াইবার আয়োজন করিয়াছিলেন উহা আজিও "ভোজনতলা" নামে পরিচিত।

প্রাচীন কাল হইতেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। "বিষ্ণুপুরী পদ্ধতি" নামক গানের ঢঙ্ ভারতের সর্ব্বত্র সম্মানিত। সঙ্গীতাচার্য্য যদুভট্ট ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের শাঁখার জিনিস, তুলসীর মালা, রেশমের শাড়ী, পাট ও তসরের কাপড়, পিতল কাঁসার বাসন এবং তামাক বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত ময়নাপুর নামক গ্রামে রাঢ়ে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক রমাই পণ্ডিত "যাত্রাসিদ্ধি রায়" নামে এক ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ময়নাপুরের প্রায় ৭ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের ধারে চাঁপাতলা নামে যে ঘাট দৃষ্ট হয় উহা ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মহামুনি দুর্ব্বাসা, নারদ, কপিল প্রভৃতির তপস্যার স্থান এবং গুপ্তবারাণসী বলিয়া বর্ণিত "চাপায়ের ঘাট"। রাজা রঘুনাথ মল্লের রাজত্বকালে কবি রমাই পণ্ডিত ধর্ম্ম পূজার মাহাত্ম্যসূচক প্রসিদ্ধ কাব্য "শূন্যপুরাণ" রচনা করেন।

বাঁকুড়া—খড়গপুর জংশন হইতে ৭২ মাইল। জেলার সদর শহর বাঁকুড়ার উত্তরে গন্ধেশ্বরী নদী ও দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত। বাঁকুড়া পূর্ব্বে মল্লভূম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মল্লরাজগণের পতনের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। বাঁকুড়া শহরটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত ও স্বাস্থ্যকর। এখানে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি মেডিকেল স্কুল ও একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় আছে। অল্পবয়স্ক কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধনের জন্য এখানে একটি "বরস্টল জেল" আছে। এখান হইতে পিতলের বাসন, সুতা ও তসরের বস্ত্র, শাঁখার গহনা, হরিতকী ও বহেড়া প্রভৃতি নানা স্থানে রপ্তানি হয়। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর শিব বা মণিনহাদেবের মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

বাঁকুড়া হইতে "বাঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথ" নামক একটি ছোট মাপের (ন্যারো গেজ) রেলপথে এই জেলার ও বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে যাওয়া যায়। এখান হইতে অনেকগুলি বাস সার্ভিসও আছে।

সোনামুখী—বাঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথে বাঁকুড়া হইতে ২৬ মাইল দূরে সোনামুখী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে গালা প্রস্তুত হয় এবং এখানকার তসর কাপড়, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও মাটির জিনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের আদি কথক গদাধর চক্রবর্ত্তী, বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক মনোহর দাস ও ঠাকুর হরনাথ সোনামুখীর অধিবাসী ছিলেন। ঠাকুর হরনাথের পুরা নাম হরনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ইনি কাশ্মীর রাজ্যের ধর্ম্মার্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, উত্তর-কালে ধর্ম্মচর্চা করিয়া বিশেষ বিখ্যাত হন। বাংলাদেশে হরনাথ ঠাকুরের অনুরক্ত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন।

ইন্দাস—বাঁকুড়া হইতে ৪২ মাইল পূর্ব্বে "বাঁকুড়া দামোদর নদ" রেলপথের উপর অবস্থিত ইন্দাস একটি প্রাচীন স্থান। মল্লরাজগণের সময়ে ইহা ইন্দ্রহাস রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এই গ্রাম খ্যাতনামা তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিতের জন্মভূমি। ইন্দাসের নিকটবর্ত্তী শ্রীপুর গ্রাম ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ খ্যাতনামা চিকিৎসক স্যর কেদারনাথ দাস মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম বিখ্যাত "শুভঙ্করী" নামক গণিত পুস্তক প্রণেতা শুভঙ্কর দাসের জন্মস্থান। এই গ্রামে "শুভঙ্করের দাঁড়া" নামে একটি প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসযোগে ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত খাতড়া নামক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে যাওয়া যায়। এই স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি মুনসেফী আদালত ও গালা তৈয়ারী করিবার দুইটি কারখানা আছে। খাতড়ার নিকটে "মশক পাহাড়" নামে একটি পাহাড় আছে।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর সীমার শেষগ্রাম মেঝিয়া বাঁকুড়া হইতে মোটরবাস যোগে যাওয়া যায়। ইহা দামোদর নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে গালা প্রস্তুত হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর ও বাঁশকুণ্ডি প্রভৃতি গ্রামে কয়লার খনি আছে। মেঝিয়ার অনতিদূরস্থ ভুলুই নামক গ্রামে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদ জগৎরাম রায়ের পুত্র। ইঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া "অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে পরিচিত এক রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণে সীতা কর্ত্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বৃত্তান্ত আছে। রামপ্রসাদ রায় "দুর্গা পঞ্চরাত্র" ও "কৃষ্ণলীলামৃত" নামে অপর দুই খানি গ্রন্থও রচনা করেন।

ছাতনা—বাঁকুড়া হইতে ৮ মাইল এবং খড়গপুর জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। এখানে বাশুলী দেবীর একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। তবে অধিকাংশের মতে বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। অনেকের অনুমান যে একাধিক প্রাচীন কবির চণ্ডীদাস নাম ছিল, ছাতনা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জন্মস্থান হইতে পারে।

ছাতনার প্রাচীন নাম ছত্রিনা। এক সময় ইহা একটি রাজবংশের রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

ছাতনা হইতে ৬ মাইল উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে উহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে খোদিত। কাহারও কাহারও মতে দিল্লীর প্রসিদ্ধ মরিচা-হীন লৌহের জয়স্তম্ভ এই চন্দ্ররাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শুশুনিয়া গ্রামে পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয় এবং পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হইতে শিল, নোড়া, টালি, চাকি, মাইল স্টোন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে চালান যায়।

ছাতনা স্টেশন হইতে শুশুনিয়া মোটরবাসে যাওয়া যায়।

ঝাঁটিপাহাড়ী—বাঁকুড়া হইতে ১৪ এবং খড়্গপুর জংশন হইতে ৮৬ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত। এখানে ঘুটিং চূর্ণ প্রস্তুত করিবার একটি বৃহৎ কারখানা আছে।

আদড়া জংশন—খড়্গপুর জংশন হইতে ১০৫ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি বড় জংশন। এখান হইতে দুইটি শাখা লাইন একদিকে আসানসোল জংশন এবং অপর দিকে গোমো জংশন স্টেশনে গিয়া ইস্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেল পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্য একটি শাখা লাইন বাংলা নাগপুর রেলপথের নাগপুরগামী প্রধান লাইনের সিনি জংশন হইতে পুরুলিয়া হইয়া এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। আদড়ায় বাংলা নাগপুর রেলপথের ট্রাফিক বিভাগের একটি সদর অফিস অবস্থিত। এখানে বহু রেল কর্ম্মচারীর বাস এই রেলওয়ে উপনিবেশটিতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, প্রমোদাগার, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র ও পাঠাগার প্রভৃতি আছে। আদড়ার গির্জাটি দেখিতে অতি সুন্দর।

আদড়া হইতে সাড়ে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত রঘুনাথপুর মানভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ও মুনসেফী আদালত আছে। এখানকার তসরের কাপড় অতি সুন্দর।
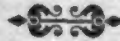
(গ) খড়্গপুর-সিনি—চক্রধরপুর

ঝাড়গ্রাম—খড়গপুর জংশন হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা। রেল লাইন খুলিবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং এখানে পাইক ও চুয়াড় প্রভৃতি দস্যুবৃত্তিধারী জাতি বাস করিত।

রেলের কল্যাণে ঝাড়গ্রাম একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের বহু রাজবংশধরের বাস। ঝাড়গ্রামের গড়ের মধ্যে রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে, ইহা একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। এখানে কোন প্রতিমা নাই, সিন্দুর রঞ্জিত একখানি বৃহৎ খড়গ ও একটি পেটিকার উপর নিত্য অর্চ্চনা হয়। কথিত আছে এই পেটিকার মধ্যে এক গুচ্ছ কেশ আছে, উহা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর কেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাবিত্রী দেবী নাকি ছিলেন মানবী। প্রবাদ, জনক-জননীর সহিত ওড়িষ্যা গমন পথে ঝাড়গ্রামের নিকট তৎকালীন জনৈক দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া বাল্যকাল হইতে ইনি দস্যু সর্দ্দারের গৃহে লালিত পালিত হন। তিনি নিজেকে "সবিতার দাসী সাবিত্রী" নামে পরিচয় দিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দস্যু সর্দ্দারের পুত্র তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দৈবপ্রেরিত খড়গের সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। সরোবর মধ্যস্থ একটি মন্দিরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ঝাড়গ্রামের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দস্যুগণের হস্ত হইতে ঝাড়গ্রাম অধিকার করিয়া লন। এই নবীন রাজাও সাবিত্রী দেবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সাবিত্রী দেবী এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু বিবাহের দিন অপরাহ্ণে তিনি সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া একাকিনী অদূরবর্ত্তী শালবনের দিকে চলিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইবামাত্র অতি ব্যস্ততার সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাজানুসৃতা সাবিত্রী দেবী শালবন পার হইয়া এক বালুকা প্রান্তরে পৌঁছিলে রাজা শশব্যস্তে তাঁহার দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ ধরিয়া ফেলিলেন। অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে বালুকারাশি আসিয়া সাবিত্রী দেবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। রাজাও বালুকারাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অনুচরেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সরাইয়া আনিল। সাবিত্রী দেবীর একগুচ্ছ কেশ রাজার হস্তে রহিয়া গেল। অতঃপর স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাজা সাবিত্রী দেবীর কেশ গুচ্ছ ও খড়গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ঝাড়গ্রাম গড়ের দুই মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগাল দেব বাহাদুরের নির্ম্মিত মেল বাঁধ ও কেরেন্দার বাঁধ নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া ঝাড়গ্রামের বিশেষ খ্যাতি আছে। এখানকার পানীয় জল অতি সুস্বাদু এবং শালবনের হাওয়া ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সুন্দর ও মনোরম।

গিধনি—খড়গপুর জংশন হইতে ২৪ মাইল দূর। ইহাও একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। গিধনি মেদিনীপুর জেলা তথা বাংলার শেষ রেলওয়ে স্টেশন। কলিকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি এখানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে একটি ডাকবাংলা আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যাই অধিক।

চাকুলিয়া—খড়্গপুর জংশন হইতে ৩৪ মাইল দূর। এই স্থান হইতে সিংহভূম জেলার আরম্ভ। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন মর্গ্যান্ নামে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি চাকুলিয়ার তদানীন্তন সর্দ্দারকে পরাস্ত করিয়া ধলভূম পরগণার এই অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে একটি পুরাতন ঘাটোয়ালী দুর্গ ও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চাকুলিয়া হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে বেন্দ নামক গ্রামে সরস্বতী পূজার সময় সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি মেলা হয়।

ধলভূমগড়—খড়্গপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল দূর। ইহা সিংহভূম জেলার একটি মহকুমা। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধলভূম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহালের অধীন ছিল। জঙ্গল-মহাল উঠিয়া যাওয়ার পর ইহা সিংহভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধলভূমগড়ে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস, এই বংশের উপাধি ধবলদেব। ধলভূম বা ধবলভূম পূর্ব্বে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ধলভূমের রাজবংশ রাজপুত বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে রঙ্কিনী দেবীর বরে জনৈক রজক (ধল) এই পরগণার অধীশ্বর হইয়া এক ব্রাহ্মণ কুমারীকে বিবাহ করে। এই ধল বা রজকের বংশধরগণের আখ্যা হয় ধবলদেব। স্বাধীন ধলভূম রাজ্যের অধীনে কয়েকটি সামন্তরাজ্য ছিল। উহাদের মধ্যে সেরাইকেলা ও খারসোয়ানের নাম উল্লেখ যোগ্য। বর্ত্তমানে এই দুইটি রাজ্য ওড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

ধলভূম পরগণার অধিবাসিগণের মধ্যে ভূমিজ, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি প্রধান। ভূমিজগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইঁহাদের মধ্যে "ঘাটওয়াল" উপাধিধারী এক শ্রেণীর জমিদার বা জায়গীরদার আছেন। এই উপাধি ও জায়গীর প্রথা স্বাধীন ধলভূম রাজগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঘাটওয়ালগণ লোকলস্কর ও পাইক রাখিয়া রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানযুগেও সিংহভূম জেলায় ঘাটওয়ালগণের বিশেষ প্রাধান্য আছে। এই মহকুমার অধিকাংশ অধিবাসী বাংলাভাষা ভাষী।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ধলভূমের রাজা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ সিংহ ধবলদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ধলভূমের বর্ত্তমান রাজবংশ এই জগন্নাথ সিংহের উত্তরাধিকারী।

ঘাটশিলা—খড়্গপুর হইতে ৬১ মাইল দূরে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত ঘাটশিলার নাম স্বাস্থ্যকামী মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। এখানকার জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর বলিয়া বহু সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোক এখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ছুটির সময় এখানে আসিয়া অবসর যাপন ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে ঘাটশিলাতে ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঘাটশিলায় রঙ্কিনী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। পূর্ব্বে এই দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রঙ্কিনীদেবীর মন্দির চত্বরে বিন্দু-উৎসব নামে একটি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু দূরদেশাগত সাঁওতালগণই এই উৎসবের হোতা। একটি মহিষকে তীর বিদ্ধ করিয়া হত্যা করাই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ঘাটশিলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। নীল পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত গ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিতা সুবর্ণরেখার সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়।

ঘাটশিলা হইতে তিনমাইল দূরে মৌ-ভাণ্ডারে একটি তামার খনি ও কারখানা আছে।

ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী পঞ্চপাণ্ডব নামক স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি বলিয়া কথিত পাঁচটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গালুড়ি—খড়্গপুর জংশন হইতে ৬৭ মাইল। ইহাও একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। চতুর্দ্দিকে পাহাড় ও শালবন থাকায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতি মনোরম। গালুড়ি হইতে তিন মাইল দূরে রাখা নামক স্থানে তামার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গালুড়ির পর "রাখা মাইনস্" নামে একটি রেলস্টেশন আছে।

টাটানগর—খড়্গপুর জংশন হইতে ৮৪ মাইল দূর। ইহা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র। পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে যে কেহ ভারত ভ্রমণে আসেন তিনি টাটানগরের বিরাট কারখানাটি না দেখিয়া যান না। এখানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ইস্পাত, টিন ও লোহার কড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং এই সকল দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষকে আর পূর্ব্বের ন্যায় ততটা পর দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। পরলোকগত জমসেদজী টাটার নামানুসারে এই স্থানের নাম হইলেও, বাঙালীর সহিত ইহার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু মহাশয় নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে লৌহখনি আবিষ্কার করেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই পরামর্শে বোম্বাইএর ধনিকগণ বিপুল ধনভাণ্ডার লইয়া এক অজ্ঞাত, অখ্যাত ও উপেক্ষিত গণ্ডগ্রাম সকচীতে উপস্থিত হন। সকচী পরে কালীমাটি নাম ধারণ করে এবং কালীমাটি আজ ভুবনবিখ্যাত টাটানগর। বর্ত্তমানে টাটানগরের মত সমৃদ্ধ শ্রমিক কেন্দ্র ভারতে আর একটিও নাই।

টাটানগর হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাদাম পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইন দিয়াই টাটার কারখানার জন্য অধিকাংশ লৌহপ্রস্তর আনীত হয়। টাটানগরের পরবর্ত্তী স্টেশন গোমারিয়া হইতে অপর একটি শাখা লাইন ৮৯ মাইল দূরবর্ত্তী বরকাকানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথের মুড়ী জংশনে নামিয়া ছোট মাপের গাড়ীতে রাঁচী যাইতে হয়।

সিনি জংসন—খড়্গপুর জংশন হইতে ১০০ মাইল দূর। ইহা সেরাইকেলা রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন রাজখরসোয়ান ও চক্রধরপুর হইয়া নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে এবং একটি শাখা লাইন মানভূম জেলার সদর শহর পুরুলিয়া হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলপথের আসানসোল স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

খরসোয়ান—প্রাচীন ধলভূম রাজ্যের অধীন একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। ইহা বর্ত্তমানে ওড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। রাজ-খরসোয়ান হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গুয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। গুয়ায় ম্যাঙ্গানিজের খনি আছে। এই শাখাপথে চাঁইবাসা উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা সিংহভূম জেলার সদর শহর। শহরটি রোরো নামক একটি পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত ও চারিদিকে অনুচ্চ পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর ও ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও নয়নানন্দকর। শহরের মধ্যে মধুবাঁধ, শিববাঁধ, রাণীবাঁধ নামে পরিচিত কয়েকটি সুন্দর জলাশয় আছে।

সিংহভূম জেলায় হো, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু আদিম জাতির বাস। এই জেলা বনজ ও খনিজসম্পদে পরিপূর্ণ। লৌহ, তাম্র ও অভ্র এখানকার প্রধান খনিজ পদার্থ। এই জেলায় বহু পরিমাণে রেশম ও লাক্ষা উৎপন্ন হয়।

(ঘ) সিনি-পুরুলিয়া—আসানসোল

চাণ্ডিল—সিনি জংশন হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

এই থানার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত দলমি একটি বিধ্বস্তপ্রায় প্রাচীন নগরী। এখানে "ছাতাপুকুর" নামে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ বা দীঘি আছে। কথিত আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এখানে স্নান করিতে আসিতেন। দলমিতে অনেকগুলি পুরাতন গড় ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। দলমির উত্তর-পশ্চিমে সাফারণ নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। ইহার সন্নিকটেও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে এখানে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

দলমি নামে একটি রেল ষ্টেশনও আছে। সেখানে নামিয়া দলমিতে যাওয়া যায়।

বরাহভূম—সিনি জংশন হইতে ৩১ মাইল দূর। বরাহভূম অতি প্রাচীন স্থান। ভবিষ্য পুরাণে ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়। পুরাকালে এখানে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে।

লায়া উপাধিধারী এক ব্যক্তি দলমা পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে এক বৃহৎ অজগরের উপর উপবিষ্ট হইয়া কালীর উপাসনা করিত। একদিন সে গিয়া দেখিতে পাইল যে অজগরটি স্বস্থানে নাই এবং নিকটেই দুইটি শূকর ক্রীড়া করিতেছে। ক্রোধে তরবারি হস্তে লইয়া লায়া বরাহ-মিথুনকে তাড়া করিল। শূকরটি ছুটিয়া পলাইল কিন্তু শূকরীটি গর্ভিনী থাকায় দ্রুত পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। লায়া তরবারির এক আঘাতে উহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। তখন শূকরীর উদর হইতে দুইটি দিব্যকান্তি মানবশিশু বাহির হইল। ব্যাপার দেখিয়া লায়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই দৈববাণী হইল যে এই শিশু দুইটি দেবপুত্র, লায়া যেন তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রবৎ পালন করে। লায়ার নিজের সন্তান ছিল না, সুতরাং শিশু দুইটিকে সে পরম আদরে লালন-পালন করিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুদ্বয়ের রূপ-লাবণ্য ও শৌর্য্য-বীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া লোকে সন্দেহ করিত যে ইহারা কখনই লায়ার পুত্র নহে, নিশ্চয়ই কোন রাজার পুত্র। একদিন কিশোরবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় পালক পিতার অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিল এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে গিয়া আত্ম-পরিচয় দিল যে তাহারা দেবকুমার, মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে কোন রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করুন। তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য একটি তোরণের নিম্নদেশে তীক্ষ্ণধার অসি-ফলক ঝুলাইয়া তাহার নিম্ন দিয়া তাহাদিগকে পূর্ণবেগে অশ্বারোহণে যাইতে আদেশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ কুমার অশ্বচালনা করিয়া তোরণের নিম্নদেশে উপস্থিত হইলে অসিফলকে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কনিষ্ঠকুমার তাহা দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পূর্ণবেগে অশ্বচালনা করিয়া তোরণের দিকে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা দুই ভাই যে দেবকুমার সে বিষয়ে তাঁহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি কনিষ্ঠকুমারকে তুঙ্গভূম ও সামন্তভূমের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন। এই ভূভাগই বরাহভূম নামে প্রসিদ্ধ। কুমারদ্বয় দেবঅংশরূপী বরাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম রাখিলেন বরাহভূম। এই রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। বরাহভূম ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত বরাবাজার নামক গ্রামে তাঁহারা বাস করেন। বরাবাজারে অনেকগুলি গালার কারখানা আছে।

শরশঙ্কদীঘি, দাঁতন (পৃষ্ঠা ১৪৫)
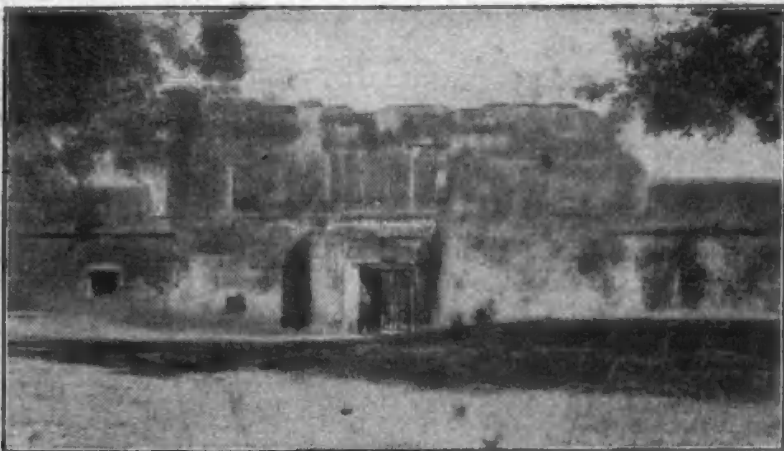
প্রাচীন দুর্গ, মেদিনীপুর (পৃষ্ঠা ১৪৬)
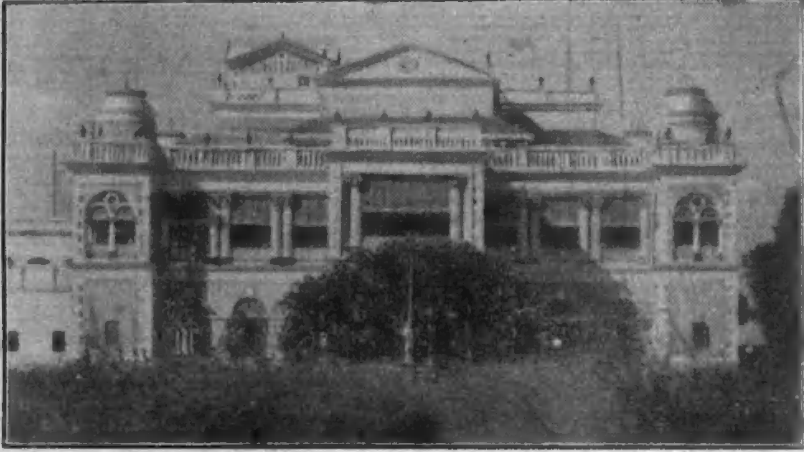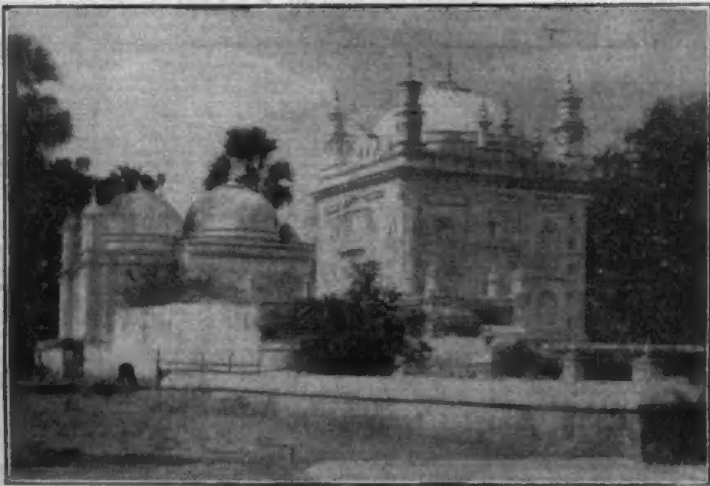
নাড়াজোল রাজভবন, মেদিনীপুর (পৃষ্ঠা ১৪৬)

খানকা শরীফ, মেদিনীপুর (পৃষ্ঠা ১৪৬)

সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, গড়বেতা (পৃষ্ঠা ১৫১)

কৃষ্ণরায়ের মন্দির, বগড়ী-কৃষ্ণনগর (পৃষ্ঠা ১৫১)
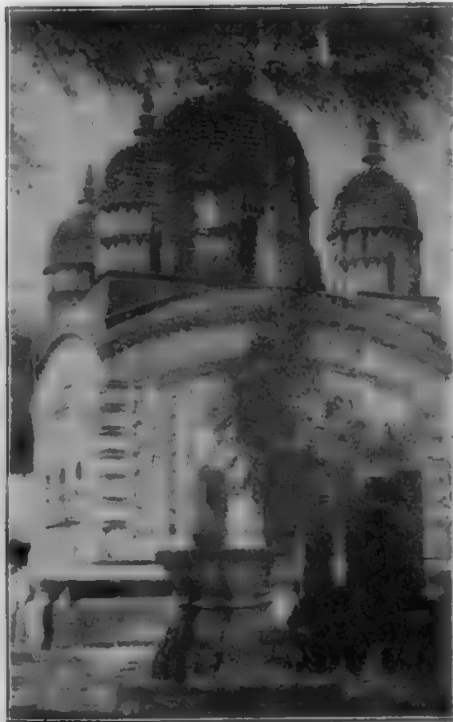
কৃষ্ণরায় মন্দিরের অপর দৃশ্য, বগড়ী-কৃষ্ণনগর (পৃষ্ঠা ১৫১)

মদনমোহন-মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

কালাচাঁদের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)
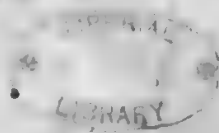
জোড়-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

দলমাদল কামান, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

রাধাশ্যামের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

রাসমঞ্চ, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

মদন গোপালের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)

মল্লিমহাদেবের মন্দির, বাঁকুড়া (পৃষ্ঠা ১৫৪)

বাশুলীর প্রাচীন মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)

বাশুলীর দ্বিতীয় মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)

বাশুলীর বর্ত্তমান মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)

রাজপ্রাসাদ, ঝাড়গ্রাম (পৃষ্ঠা ১৫৭)

তামার কারখানা, মৌভাণ্ডার (পৃষ্ঠা ১৫৯)

টাটানগরের বাজারের একটি দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)
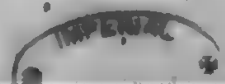
টাটার কারখানার একটি দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)

টাটানগরের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)

কুষ্ঠাশ্রম, পুরলিয়া (পৃষ্ঠা ১৬১)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বরাহভূমের রাজা গঙ্গানারায়ণের সহিত ইংরেজ সরকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং মানভূমের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাসেল সাহেব গঙ্গানারায়ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঁকুড়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর গঙ্গানারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন কিন্তু ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ডেণ্টের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। এই ঘটনার পর বরাহভূম রাজ্য ইংরেজের খাস শাসনাধীনে আসে।

পুরুলিয়া—সিনি জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার সদর শহর। এই শহর হইতে ৩ মাইল দূরে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিশনারীগণ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। প্রায় ৬০০ বিঘা জমির উপর এই আশ্রমটি অবস্থিত। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রম।

সাহেববাঁধ নামক জলাশয় পুরুলিয়া শহরের অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ১৫০ বিঘা জমি জুড়িয়া এই বৃহৎ বাঁধটি অবস্থিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কয়েদী মজুরগণের দ্বারা ইহা খনন করান হয়।

পুরুলিয়া হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ছোট বলরামপুর নামক গ্রামে জৈন তীর্থঙ্করদিগের স্তূপ ও হিন্দু মন্দির সমূহের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পুরুলিয়া হইতে এই জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস সার্ভিস আছে। চেলিয়ামা হইতে সাত মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত তেলকুপি (তৈলকম্প) মানভূম জেলার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন স্থান; ইহা পঞ্চকোটের শেখর রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই গ্রামে মন্দিরাদি বহু পুরাকীর্ত্তি আছে। পৌষ ও চৈত্রমাসে এখানে খালুই-চণ্ডী ও বারুণী উৎসব উপলক্ষে মেলা হয়।

মানভূম জেলা খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কয়লা, স্বর্ণ, অভ্র, গৈরিক বা গিরিমাটি, প্রস্তর, ফায়ার ক্লে, কেয়লিন ও গ্রাফাইট্ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কোড়া, মুণ্ডা, উরাও, ভুঁইয়া ও খেড়িয়ার নাম উল্লেখযোগ্য এই জেলার শতকরা ৭২ জন লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

পুরুলিয়া হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি ছোট মাপের (ন্যারো গেজ) লাইন মুড়ী জংশন হইয়া প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস রাঁচী শহর দিয়া ৮৩ মাইল দূরবর্ত্তী ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারডাগা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে গড়-জয়পুর ও ঝালদা মানভূম জেলার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য স্টেশন। গড়-জয়পুর পুরুলিয়া হইতে ৯ মাইল দূর। এই স্থান হইতে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বোড়াম গ্রামে তিনটি প্রাচীন জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দির তিনটির গঠন প্রণালী বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ। পুরুলিয়া হইতে ঝালদার দূরত্ব ১৩ মাইল। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি, থানা, হাসপাতাল, স্কুল, ডাকঘর ও ডাকবাংলা প্রভৃতি আছে। এখানকার লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মধুকুণ্ডা—আদ্রা জংশন হইতে আসানসোলের দিকে ১৭ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বেহারীনাথ পাহাড়ে যাইতে হয়। মধুকুণ্ডা স্টেশন হইতে বেহারীনাথ পাহাড় প্রায় ৬ মাইল দূর। যাইবার জন্য মোটরবাস পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে বেহারীনাথ পাহাড়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার উচ্চতা ১৪৭১ ফুট। এই পাহাড়ে বেহারীনাথ শিবের মন্দির আছে। তথায় শিবরাত্রি ও চড়কের সময় বিশেষ সমারোহ হয়।

মধুকুণ্ডা মানভূম জেলায় শেষ স্টেশন। ইহার পার্শ্ব দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। দামোদরের অপর পার হইতে বর্দ্ধমান জেলার আরম্ভ।

উপসংহার

একদিকে মধ্যপ্রদেশ, অপরদিকে দক্ষিণভারত,—বাংলা নাগপুর রেলপথ ভারতের এই দুইটি অংশকে বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, রায়পুর, বিলাসপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি নগর, আর দক্ষিণভারতের তীর্থক্ষেত্র সমূহ,—বাংলা নাগপুর রেলপথ বাংলাদেশের সঙ্গে ইহাদের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। মাদ্রাজ, মহিসুর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এই রেলপথ দিয়াই যাইতে হয়। বাংলা নাগপুর রেলপথের নিজের লাইনেও তীর্থস্থানের অভাব নাই। মহাতীর্থ পুরুষোত্তমদেবের স্থান পুরীধামের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, সাক্ষীগোপাল সবই এই পথের উপর। বাংলা নাগপুর রেলপথে বহু নদনদী, পর্ব্বতমালা ও গভীর অরণ্যানী থাকায় ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি রমণীয়। পুরীর সমুদ্রের মহান্ ও গম্ভীররূপ, ওয়ালটেয়ারের প্রান্তবাহী নীলজলধির লহরলীলা ও পার্ব্বত্যনিবাস রাঁচীর অনবদ্য সৌন্দর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করে।

আসাম বাংলা রেলপথে বাংলাদেশ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগে যখন গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হইল, তখন সরকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গকে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুর বিদ্রোহের পর সরকার "আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি" নামক একটি কোম্পানির সহিত চুক্তি করেন যে উক্ত কোম্পানি আংশিকভাবে সরকারী অর্থসাহায্যে মোট ৭৪০ মাইল রেলপথ খুলিবেন।

আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে রেলপথ খুলিতে কোম্পানিকে বহু অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনেক জায়গায় পর্ব্বত মধ্যে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া রেলের লাইন পাতিতে হইয়াছিল। বদরপুর—লাম্‌ডিং বিভাগে রেলের লাইন নির্ম্মাণ করিতে কোম্পানির ১১ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই শাখা লাইন পার্ব্বত্য প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার দুই দিকের অরণ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বড়লাট লর্ড কর্জন চট্টগ্রাম শহরে আসাম বাংলা রেলপথের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর কোম্পানি আরও অনেকগুলি শাখা লাইন খুলিয়া রেলপথকে বাংলা ও আসামের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সকল শাখার মধ্যে আখাউড়া-আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার-টঙ্গী, কুলাউড়া-শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার ও চাপারমুখ-শিলঘাট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে পূর্ব্বে খেয়া স্টীমারযোগে যাত্রী ও মালগাড়ী পারাপার করা হইত। সম্প্রতি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে মেঘনা নদীর উপর এক বিশাল সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের নামানুসারে এই সেতুর নাম রাখা হইয়াছে "ষষ্ঠ জর্জ সেতু"। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯৪৭ ফুট। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে সেতু। এখন রেলগাড়ী চট্টগ্রাম হইতে একেবারে সরাসরি পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের জগন্নাথগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইতেছে। ইহাতে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আসাম বাংলা রেলপথের স্টেশন সংখ্যা ৩১৫টি ও মোট দৈর্ঘ্য ১৩০৬ মাইল। এই রেলপথের সমগ্র লাইনই মিটার গেজ বা মাঝারি মাপের। ইহা বাংলা ও আসাম প্রদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, শিবসাগর, নওগাঁ, লখিমপুর ও কামরূপ এই একাদশটি জেলার মধ্য দিয়া প্রসারিত।

আসাম বাংলা রেলপথ দিয়া বাংলাদেশের যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানে যাওয়া যায় নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। যদিও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অধুনা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উহারা বাংলাদেশ হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই দুই জেলার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করা হইল।

(ক) ময়মনসিংহ-আখাউড়া-টঙ্গী-ভৈরববাজার বিভাগ

গৌরীপুর—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। গৌরীপুরে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস।

এখান হইতে আসাম বাংলা রেলপথের একটি শাখা ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী মোহনগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মোহনগঞ্জ একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে কয়েকটি প্রকাণ্ড বিল আছে। উহাদিগকে "হাওর" বলে। "হাওর" কথাটি "সাগর" শব্দের অপভ্রংশ। বর্ষাকালে এই সকল বিল যখন জলপ্লাবিত হইয়া যায় তখন উহাদিগকে দেখিতে ঠিক সমুদ্রের মত দেখায়।

মোহনগঞ্জ শাখা লাইনে শ্যামগঞ্জ জংশন ও নেত্রকোণা উল্লেখযোগ্য স্টেশন। শ্যামগঞ্জ হইতে অপর একটি শাখা লাইন ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী জড়িয়াঝঞ্ঝাইল নামক প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নেত্রকোণা ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা। ইহা মগরা নামক একটি পার্ব্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটির দৃশ্য অতি সুন্দর। বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে নেত্রকোণার নিকটস্থ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরে গারো ও হাজংদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈশ্য গারো যখন সুসঙ্গ পাহাড় মুলুকের রাজা, সেই সময় সোমেশ্বর পাঠক নামক একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন বলিয়া কথিত। তিনি বহু অনুচরের সাহায্যে বৈশ্য গারোকে পরাজিত করিয়া সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

খালিয়াজুরী রাজ্য পরে নরোত্তম নামক একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীর শাসনাধীন হয়। ইঁহার বংশীয়েরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে "পাঞ্জা ফারমান" পাইয়া ভাটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

বোকাইনগর—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১৬ মাইল। সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরের ন্যায় এখানেও হাজংদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

ঈশ্বরগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ২৮ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ও ব্যবসায়-প্রধান স্থান। এখানে একটি মুন্সেফী আদালত আছে।

আঠারবাড়ী—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৩৬ মাইল দূর। এখানে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। স্টেশন হইতে জমিদার বাড়ী প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার সংলগ্ন একটি চিড়িয়াখানায় হরিণ, ভল্লুক, ময়ূর, সারস প্রভৃতি পশুপক্ষী রক্ষিত আছে। এখানকার রাধাগোবিন্দজী ও জগদ্ধাত্রী দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। নিকটবর্ত্তী "রায়ের বাজার" ও "খালবোলা" বাজার নামক দুইটি বাজার হইতে প্রতি বৎসর বহু টাকার পাট চালান যায়।

কুকী বালক-বালিকা (পৃষ্ঠা ১৬৭)

জগন্নাথ মন্দির, কুমিল্লা (পৃষ্ঠা ১৬৮)

ব্যাস সরোবর (পৃষ্ঠা ১৭২)
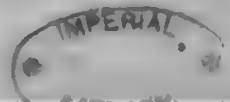
চন্দ্রনাথের পথের দশা (পৃষ্ঠা ১৭১)

নীলগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৩৬ মাইল। প্রাচীন কবি দ্বিজবংশী ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান পাতীপাতুয়ারী গ্রাম স্টেশন হইতে মাত্র আধ মাইল দূর। দ্বিজবংশীকৃত সুবৃহৎ পদ্মাপুরাণ আজও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে সামাজিক অনুষ্ঠানে গীত হয়। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন, এবং দলবল লইয়া তাঁহার করুণ সুললিত মনসার ভাসান বা বেহুলার গান গাহিয়া বেড়াইয়া লোকশিক্ষার সাহায্য করিতেন। কথিত আছে, একবার তিনি এক ভীষণ নরঘাতক দস্যুর কবলে পড়িলে দস্যু তাঁহার গান শুনিয়া নিজবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। আজও বহু লোক তাঁহার পদ্মাপুরাণ গাহিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন এবং সারা গ্রন্থখানি তাঁহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। "রামায়ণ" কেনারামের উপাখ্যান, মলুয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি চন্দ্রাবতী কবি দ্বিজবংশীর কন্যা।

কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৫২ মাইল দূর। ইহা ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা। বল্লালসেন যখন বিক্রমপুর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গলবাড়ীতে হাজংদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

ভৈরববাজার জংশন—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৮৩ মাইল দূর। ইহা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত ও ময়মনসিংহ জেলার একটি বিখ্যাত বন্দর। এখানে বহু মহাজনের গদি, আড়ত ও ব্যাঙ্ক আছে।

এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী ঢাকা শহরের নিকটস্থ পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের টঙ্গী স্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখার জিনারদি স্টেশন বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

দৌলতকান্দী—টঙ্গী জংশন হইতে কিঞ্চিদধিক ৩৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রায়পুরা থানার অধীন অশ্রুফপুর গ্রাম। এই গ্রামে রাজা দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন, পিতল ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত ৪০টি চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চৈত্যগুলির চারিদিকে বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ, একটি চৈত্য কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাম্রশাসন দুইটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কারণ উহা হইতে বঙ্গের খড়্গ বংশীয় রাজাদের কথা জানিতে পারা যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্যম তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ, পৌত্র দেবখড়্গ ও প্রপৌত্র রাজা রাজভট্টের নাম উল্লিখিত আছে। অনুমিত হয়, পালবংশীয় রাজা দেবপালদেবের রাজত্বের শেষভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করেন। তাম্রশাসন হইতে আরও জানা যায় যে রাজা দেবখড়্গের সময়ে অশ্রুফপুরের নিকটে "বুদ্ধ-মণ্ডপ" ও "বিহার-বিহারিকা-চতুষ্টয়" প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দৌলতকান্দী ও ভৈরববাজার জংশন এই স্টেশনদ্বয়ের মধ্যে রেলপথ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পার হইয়াছে।

আশুগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৯৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ত্রিপুরা জেলার আরম্ভ। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। সুবিখ্যাত মেঘনা সেতু আশুগঞ্জ ও ভৈরব বাজারের মধ্যে অবস্থিত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১০৬ মাইল দূর ও ত্রিপুরা জেলার অন্যতম মহকুমা। ইহা তিতাস নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান।

(খ) আখাউড়া—চট্টগ্রাম—নাজিরহাট ঘাট—দোহাজারী

আখাউড়া জংশন—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১১৬ মাইল দূর। এখানে আসাম বাংলা রেলপথের প্রধান লাইন দক্ষিণে চট্টগ্রামের দিকে এবং উত্তরে বদরপুর-শিলচর অভিমুখে গিয়াছে; ময়মনসিংহ ও টঙ্গী হইতে একটি শাখা লাইন এখানে আসিয়া মিশিয়াছে।

আগরতলা—আখাউড়া জংশন স্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা মোটরবাস বা ঘোড়ার গাড়ী যোগে যাইতে হয়।

আগরতলা আধুনিক প্রথায় নির্ম্মিত একটি সুন্দর শহর। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, সুদৃশ্য উদ্যান, নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর ও মনোরম প্রাসাদাবলী ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। রাজপ্রাসাদ উজ্জয়ন্ত দূর হইতে ছবির ন্যায় সুন্দর দেখায়। দর্শনার্থীর সুবিধার জন্য মহারাজার একটি অতিথিশালা আছে।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলগুলি ব্যাঘ্র, হরিণ, মহিষ ও হস্তীতে পূর্ণ। রাজ্যের খনিজ সম্পদও প্রচুর।

ত্রিপুরা রাজগণের মধ্যে অনেকেই বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজ্যের সরকারী কার্য্যাদি বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়। ত্রিপুরা রাজবংশকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজার নাম হিজ্ হাইনেস্ বিষম সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজা স্যার বীর-বিক্রম কিশোর দেব বর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই।

ত্রিপুরার রাজবংশ অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে ত্রিপুর রাজবংশকে প্রাচীনতম বলিয়া দাবী করা হয়। শুধু ভারতে নহে, চীন দেশ ভিন্ন পৃথিবীর কোথাও এরূপ সুদীর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব করেন না। ইঁহারা চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। এই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত যযাতি পুত্র দ্রুহ্য হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের বিজয়-বাহিনী এককালে আরাকানী, মগ ও নিকটস্থ পার্ব্বত্য জাতিগুলিকে বশে আনিয়াছিল। "রাজমালা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ত্রিপুর নৃপতিগণের কীর্ত্তি কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশ প্রবাদ ও কিংবদন্তীমূলক হইলেও পরবর্ত্তী অংশে বংশানুক্রমিক ইতিহাস পাওয়া যায়। কহলণের প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণীর সহিত এই পুস্তকের তুলনা চলে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আদিমকাল হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ, দ্বিতীয় ভাগে ১৪৫৮ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ ও তৃতীয় ভাগে ১৬৬৩ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছুপর পর্য্যন্ত সময়ের বিবরণ আছে। পূর্ব্বে রাজমালা ত্রিপুর ভাষাতে লিখিত ছিল। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশে ইহা সুভাষা অর্থাৎ বাংলায় রচিত হয়।

এই বংশের ত্রিপুররাজের মৃত্যুর পর তৎপত্নী রাণী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হয় বলিয়া কথিত। ইহার পার্ব্বত্য নাম ছিল "সুব্রারাই" এবং ইনি পরম শৈব ছিলেন। ইনি ত্রিপুররাজের পুত্র বলিয়া যেমন চন্দ্রবংশীয় চিহ্ন নিশান ও চন্দ্রধ্বজ ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ শিবাংশে জন্ম বলিয়া ত্রিশূল চিহ্নিত ধ্বজও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের ধ্বজে চন্দ্র ও ত্রিশূল উভয়, চিহ্নই ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত আছে, ত্রিলোচন পাণ্ডবদের সমসাময়িক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১২৪০ খৃষ্টাব্দে দ্রুহ্য হইতে ১৩৩ স্থানীয় রাজা ছেংথোম্পার সময়ে গৌড়েশ্বরের বীর সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ বহু সৈন্য লইয়া ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা ভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইলে রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ভীত স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া স্বয়ং সৈন্যদলের নেতৃত্ব করেন। রাজাও তখন বাধ্য হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাণীর সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া ত্রিপুর সৈন্য প্রচণ্ড বেগে গৌড়সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। কথিত আছে, এই যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল। রাজা দেখিয়াছিলেন একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ এক দণ্ড আকাশে নাচিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। একলক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে নাকি কবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ছেংথোম্পা হতাহত সৈন্যে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বসিবার এক তিলও স্থান পাইলেন না ; তাঁহার জামাতা যুদ্ধে নিহত একটি প্রকাণ্ড হাতীর দন্ত দুইটি কাটিয়া শ্বশুরের জন্য আসন করিয়া দিলেন। জামাতার বল দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। তখন হইতে ত্রিপুরার রাজ জামাতারা সেনাপতির পদ পাইয়া আসিতেছেন।

মহারাজ রত্নফার সময় হইতে ত্রিপুরার রাজারা গৌড়েশ্বর সুলতান সামসুদ্দিন প্রদত্ত মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। রত্নফা বাংলা হইতে ১০,০০০ ঘর বাঙালী লইয়া গিয়া নিজরাজ্যে বসতি করান। তদবধি বাংলার সংস্কৃতি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে।

ত্রিপুর রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ)। ইঁহার স্ত্রী ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাণী কমলা দেবী এবং সেনাপতি ছিলেন চয়চাগ। পূর্ব্বে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সহস্র সহস্র বাঙালীকে বলি দেওয়া হইত। ধন্যমাণিক্য এই বলি বন্ধ করেন। তিনি অনেক দীঘি, মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বীর ও রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সেনাপতি মহাবীর চয়চাগের সাহায্যে বহু রাজ্য জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। কথিত আছে, ত্রিহুত দেশ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তিনি রাজ্যে নৃত্যগীত শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বাংলাভাষাকে উৎকর্ষ দিয়াছিলেন। রাণী কমলা দেবী তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বহু পল্লীগীতি ত্রিপুরার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

ধন্যমাণিক্য তাঁহার সৈন্যদলে জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন এবং সৈন্যেরা পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসিলে তাঁহার আদেশ অনুসারে এক তথাকথিত নীচ জাতীয় কুকী-সরদার সৈন্যদের গুণিবার ছল করিয়া একটি কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করে। রাজভয়ে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। এই সকল সৈন্য "কাঠি ছোঁয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

এই বংশের বিজয় মাণিক্যও (১৫২৯—১৫৭০ খৃষ্টাব্দ) প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি জয় করেন। এই অভিযানের সময় তিনি ব্রহ্মপুত্রের উপর এক পুল বাঁধিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাথে ৫০,০০০ লোকের এক বহর ছিল। কৈলাগড়ে "বিজয়-নন্দিনী" নামক একটি বৃহৎ খাল কাটাইয়াছিলেন এবং কৈলাগড় হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, "উহা ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত।

মহারাজ অমরমাণিক্যের (১৫৯৭—১৬১১ খৃষ্টাব্দ) প্রধান কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ দীঘি, "অমর-সাগর"। এই দীঘি খননের জন্য ভাওয়ালের রাজা, বন-ভাওয়ালের জমিদার, সরাইলের ঈশা খাঁ ও ভুলুয়ার

রাজা প্রত্যেকে ১,০০০ জন; শ্রীপুরপতি চাঁদ রায়, বাকলার বসু ও সলে গোয়ালপাড়ার গাজি প্রত্যেকে ৭০০ জন এবং অষ্টগ্রামের ও বানিয়াচঙ্গের জমিদার প্রত্যেকে ৫০০ জন করিয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে ত্রিপুর রাজের পদমর্য্যাদা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীহট্টের পাঠান রাজা ফতে খাঁ সাহায্য না করায় অমর মাণিক্য পুত্র রাজ্যধরের পরিচালনায় একটি বিপুল সেনা-বাহিনী ফতেখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁও তাঁহাকে সাহায্য করেন। ফতে খাঁ বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় আনীত হইয়াছিলেন। পরে অমর মাণিক্য বহু সৈন্য দ্বারা সাহায্য করাতে ঈশা খাঁ মুঘলদিগের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ঈশা খাঁর "মছলন্দী" বা "মসনদ-ই-আলি" উপাধি ত্রিপুর রাজ অমর মাণিক্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

মহারাজ ২য় ধর্ম্মমাণিক্য (১৭১৪—১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের (১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্বকালে সমসের গাজী নামক একজন সাধারণ ব্যক্তি অতি পরাক্রমশালী ছিলেন, কার্য্যতঃ তিনিই প্রকৃত রাজা ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্যকে পরাজিত করিয়া সমসের ত্রিপুর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যের পার্ব্বত্য জাতি সমূহ ত্রিপুর রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় সমসের লক্ষ্মণ মাণিক্যকে সিংহাসনে বসান। সমসেরের রাজ্য শাসন প্রশংসনীয় ছিল। তিনি বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। তিনি মুসলমান হইয়াও অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বয়ন শিল্প অতি প্রাচীন। রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদিগের গৃহে ব্যবহৃত এখানকার রিয়া বস্ত্রে সূতা দিয়া লতাপাতা, ফুল, দেবদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়। উহা রাজা রাজসূর্য্যের মহিষী জয়ন্ত-রাজকুমারীর উদ্ভাবনা বলিয়া কথিত। ত্রিপুরার স্বর্ণখচিত গজদন্তের পাটিরও প্রসিদ্ধি আছে।

কমলাসাগর—আখাউড়া জংশন হইতে ৭ মাইল দূর। ষ্টেশনের নিকটে একটি অনুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর কস্বা কালীবাড়ী নামক একটি প্রাচীন দেবস্থান আছে। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে মহামেলা ও বহু জন সমাগম হয়।

কমলাসাগর নামক একটি প্রকাণ্ড দীঘির নাম হইতেই স্থানটির নাম কমলাসাগর হইয়াছে। এই দীঘির জল অতি নির্ম্মল।

কুমিল্লা—আখাউড়া জংশন হইতে ২৯ মাইল দূর। ইহা ত্রিপুরা জেলার প্রধান শহর। শহরটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কুমিল্লার জগন্নাথ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার নিকটস্থ সপ্তরত্ন মন্দিরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুমিল্লার রথযাত্রা মেলায় বিস্তর জন সমাগম হয়। ইহা প্রায় ৩৫০ বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা অমর মাণিক্য বাহাদুর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপন করেন। রথের সময় ত্রিপুরা মহারাজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রথমে রথের রজ্জু স্পর্শ করেন।

কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও শহরের নিকটবর্ত্তী ময়নামতী পাহাড়ে একটি সার্ভে বা জরিপ শিক্ষার স্কুল আছে।

কুমিল্লা শীতলপাটি, হুঁকা এবং বাঁশ ও বেতের জন্য প্রসিদ্ধ।

ময়নামতীর তাঁতের "চারখানা" কাপড়েরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

কুমিল্লা হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তগত ৫১ মহাপীঠের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠে যাইতে হয়। এখানে সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল। ত্রিপুরাসুন্দরীর ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। কুমিল্লা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী রাধাকিশোরপুর নামক গ্রামে উদয়পুরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে এই স্থানে মোটর বাস যোগে যাইতে হয়। (সীতাকুণ্ড দ্রষ্টব্য)—প্রতিবৎসর পৌষ মাসে ও শিবচতুর্দ্দশীর সময় এই স্থানে বিরাট মেলা বসে। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ত্রিপুরারাজ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লালমাই—আখাউড়া জংশন হইতে ৩৬ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০।১১ মাইল বিস্তৃত।

লাক্‌সাম জংশন—আখাউড়া হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা আসাম বাংলা রেলপথের একটি বড় জংশন। এখান হইতে চাঁদপুর ও নোয়াখালি এই দুইটি শাখা লাইন বাহির হইয়াছে।

চাঁদপুর শাখার উপর লাক্‌সাম জংশন হইতে ১২ মাইল দূরে মেহার কালীবাড়ী। স্টেশনের নিকটেই সিদ্ধসাধক সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সাধনপীঠ মেহারের কালীবাড়ী অবস্থিত। এই স্থানটি নির্জ্জন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। এখানে "সর্ব্বানন্দ মঠ" নামে একটি মঠ আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হয়।

প্রবাদ, যে ঠাকুর সর্ব্বানন্দ তাদৃশ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণানন্দের সহায়তায় তিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। একবার অমাবস্যা তিথিকে তিনি ভুল করিয়া পূর্ণিমা বলিয়াছিলেন। ইহাতে সমস্ত লোকে তাঁহাকে উপহাস করে। কিন্তু সিদ্ধ সাধক সর্ব্বানন্দ বলেন যে সে দিন নিশ্চয়ই পূর্ণিমা এবং সন্ধ্যাকালে নিশ্চয়ই চন্দ্রোদয় হইবে। ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য দেবী কালিকা সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বাকাশে স্বীয় কঙ্কণ-শোভিত হস্ত উত্তোলন করেন এবং উহার জ্যোতিতে সর্ব্বত্র চন্দ্রকিরণের ন্যায় জ্যোৎস্নার বিকাশ হয়।

সর্ব্বানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রকার বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

চাঁদপুর শাখা লাইনে লাক্‌সাম হইতে ১৮ মাইল দূরে ত্রিপুরা জেলার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হাজিগঞ্জ স্টেশন অবস্থিত। চাউল ও সুপারির কারবারের জন্য এই স্থানটি প্রসিদ্ধ।

চাঁদপুরের দূরত্ব লাক্‌সাম হইতে ৩২ মাইল। ইহা ত্রিপুরা জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত এবং বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

এখানে স্টীমার স্টেশনের সহিত রেলওয়ের সংযোগ আছে।

চাঁদপুর বন্দর হইতে বহু টাকার পাট, সুপারি ও লঙ্কা চালান যায়।

নোয়াখালি শাখার উপর লাক্‌সাম জংশন হইতে ১৫ মাইল দূরে সোনাইমুড়ি ও ২২ মাইল দূরে চৌমুহানি স্টেশন অবস্থিত। এই স্টেশনদ্বয় নোয়াখালি জেলার বাণিজ্য প্রধান স্থান। চৌমুহানি সুপারির ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

নোয়াখালি শহর লাকসাম হইতে ৩১ মাইল দূর। ইহার অপর নাম সুধারাম। প্রসিদ্ধি আছে যে ইহা সুধারাম মজুমদার নামক জনৈক জমিদার কর্তৃক স্থাপিত।

নোয়াখালি শহর মেঘনা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। সম্প্রতি মেঘনা নদীর প্রবল ভাঙ্গনের জন্য সরকারী আফিস, আদালত প্রভৃতি নোয়াখালির পূর্ববর্ত্তী স্টেশন মাইজদি নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নোয়াখালির প্রাচীন নাম ভুলুয়া। এই স্থানের প্রথম রাজা বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা হইতে আগত। কথিত আছে ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুলুয়া রাজ্য স্থাপিত করেন। বিশ্বম্ভর হইতে ৭ম পুরুষ অধস্তন লক্ষ্মণমাণিক্যের বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁহার যুদ্ধকালীন বর্ম্মের ওজন নাকি এক মণ ছিল। তিনি সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার "বিখ্যাত-বিজয়" মধ্যযুগের একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক। এই বংশের একটি বিশাল কামান বাবুপুর গ্রামে আজও দৃষ্ট হয়।

ফেণী—লাক্সাম জংশন হইতে চট্টগ্রামের পথে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা নোয়াখালি জেলার মহকুমা। এখানে একটি কলেজ আছে।

এখান হইতে আসাম বাংলা রেলপথের এক শাখা ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বিলোনিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিলোনিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম মহকুমা।

কুণ্ডের হাট—লাক্সাম হইতে ৪৮ মাইল। স্টেশন হইতে পার্ব্বত্যপথে দেড় মাইল দূরে চন্দ্রকেশ্বর নামে বিরাট শিবলিঙ্গ অবস্থিত।

বাড়বাকুণ্ড(?)—লাক্সাম হইতে ৫৪ মাইল দূরে সীতাকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই স্টেশন অবস্থিত। এখানে নামিয়া প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে লবণাক্ষতীর্থে যাইতে হয়। লবণাক্ষ একটি ছোট কুণ্ড। ইহার আয়তন ৪ × ৪ × ৩ হাত। ইহার জল লবণাক্ত ও ঈষৎ উষ্ণ। লবণাক্ষ কুণ্ডের নিকটেই উত্তর-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত পর্ব্বত গাত্রে অগ্নিশিখা দিনরাত্র জ্বলিতেছে। ইহা ওয়ুধুনী নামে পরিচিত।

লবণাক্ষ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পর্ব্বতের উপর সহস্রধারা নামক ৩০০ ফুট উচ্চ একটি মনোহর জলপ্রপাত আছে। ইহাও একটি পুণ্যতীর্থ। যাত্রিগণ প্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিয়া থাকেন এবং অনেকে জলের বেগ বৃদ্ধি পাইবে এই বিশ্বাসে উলুধ্বনি বা শিবনাম উচ্চারণ করেন। লবণাক্ষ কুণ্ড হইতে সহস্রধারার পথে সূর্য্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড নামে আরও দুইটি কুণ্ড আছে।

সীতাকুণ্ড—লাকসাম ও চট্টগ্রাম জংশন হইতে যথাক্রমে ৫৮ ও ২৩ মাইল দূর। স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সুবিখ্যাত শৈব মহাপীঠ চন্দ্রনাথ পাহাড়; ইহা উচ্চতায় ১,১৫৫ ফুট। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় চন্দ্রনাথ মহাদেবের মন্দির এবং ঠিক পাশের চূড়ায় বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বাংলার নহে, চন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শাস্ত্রানুসারে কলিযুগে চন্দ্রশেখরই মহাদেবের আবাসভূমি। "কলৌ বসামি চন্দ্রশেখরে।" পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা বড়ই দুর্গম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পর্ব্বত গাত্রে বহু স্থানে সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেই জন্য চন্দ্রনাথ মহাদেব দর্শন সহজ হইয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশ বা সমতল ভূমি হইতে শিখর পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০ সোপান আছে।

চন্দ্রনাথ মন্দিরে উঠিবার পথে অনেকগুলি তীর্থ আছে। যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ পর পর দেওয়া গেল। স্টেশন হইতে বাজারের পথ ধরিয়া পাহাড়ের দিকে যাইতে প্রথমে পড়িবে ব্যাসকুণ্ড বা ব্যাস সরোবর। কথিত আছে, মৎস্যগন্ধার পুত্র মহামুনি ব্যাসদেব তপস্যা করিবার জন্য বারাণসীধামে গমন করিলে মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতি তাঁহাকে নীচকুল সম্ভূত বলিয়া অপমান করেন। অপমানে ও দুঃখে ব্যাসদেব তখন একটি নূতন কাশী সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শিব প্রীত হইলেন। কলিযুগে শিব ভারতের অগ্নিকোণে স্থিত চট্টলে চন্দ্রশেখর ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন এই আশ্বাস পাইয়া শিবেরই উপদেশ মত এই স্থানে আসিয়া ব্যাসদেব নূতন কাশী প্রতিষ্ঠা করেন। তপোবলে তিনি অন্যান্য তীর্থগুলিকে চন্দ্রনাথে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি দেবতা আসিয়া এই স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। চন্দ্রনাথ সর্ব্বতীর্থসার মহাতীর্থে পরিণত হইলে ব্যাসদেবের স্নান তর্পণের জন্য শিব ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়া ব্যাস-কুণ্ডটি সৃষ্টি করেন। পরে নৈমিষারণ্য হইতে সূত নামে কোনও ঋষি চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়া ব্যাসকুণ্ডটি খনন করাইয়া বর্ত্তমান সরোবরে পরিণত করেন। ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিম তীরে মন্দির মধ্যে ব্যাসেশ্বর শিব, ভৈরব, ব্যাসদেব ও চণ্ডিকা দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের পাশেই বটুক বৃক্ষ বা অক্ষয় বট দ্বাপর যুগ হইতে দণ্ডায়মান বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

ব্যাস সরোবর ছাড়িয়া কিছু অগ্রসর হইয়া ৭০টি সিঁড়ি অতিক্রম করিলে বামদিকে হনুমান মন্দির পড়িবে।

হনুমান মন্দিরের সম্মুখ হইতে চন্দ্রনাথের রাস্তা ছাড়িয়া নীচে ৪৫টি সিঁড়ি অবতরণ করিলে সীতাকুণ্ড পাওয়া যাইবে। কথিত আছে, বনবাস কালে শ্রীরামচন্দ্র যখন এখানে আগমন করেন তখন মহর্ষি ভার্গব সীতাদেবীর স্নানের জন্য এই কুণ্ডের সৃষ্টি করেন। কুণ্ডের পার্শ্বস্থ মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্ত্তি আছে। সীতাদেবীর মন্দিরের পশ্চাতেই পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা জ্বলিতে দেখা যায়। ইহা জ্যোতির্ম্ময় নামে খ্যাত। সীতাকুণ্ডের পার্শ্বেই রাম ও লক্ষ্মণকুণ্ড এবং মন্মথ নদ অবস্থিত।

সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দেখিয়া চন্দ্রনাথের রাস্তায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুদূর গিয়া ৬১টি সিঁড়ি অতিক্রম করিলে ভবানীদেবীর মন্দির পড়িবে। ইহা একটি পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্র-খণ্ডিত সতীদেহের দক্ষিণ বাহু এইখানে পড়িয়াছিল। "চট্টলে দক্ষ বাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।" এই মন্দিরে ভবানী বা কালী ও দশভুজার মূর্ত্তি আছে।

ভবানীমন্দির হইতে ৪৯টি সোপান আরোহণ করিলে স্বয়ম্ভূনাথ মহাদেবের মন্দির। স্বয়ম্ভূনাথের অপর নাম জগদীশ্বর। মন্দিরের উত্তরদিকে নবভৈরব এবং মন্দিরদ্বারে দ্বারপাল ভৈরব অবস্থিত। স্বয়ম্ভূনাথের ভিতর হইতে সর্ব্বদা জল বাহির হইতেছে। মন্দির মধ্যে রামসীতা ও অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। যাত্রীরা স্বয়ম্ভূনাথ দর্শন করিয়া বাহিরে আসিয়া সাক্ষীশিব দর্শন করেন।

স্বয়ম্ভূনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিকটে শম্ভু নামে এক রজক বাস করিতেন। তাঁহার একটি কপিলা গাভী গ্রামে প্রচুর আহার পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন পাহাড়ের দিকে কোথায় পলাইয়া যাইত এবং রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিত। একদিন রজক গাভীর পিছনে পিছনে যাইয়া দেখিলেন যে উহা পাহাড়ে উঠিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উহার স্তন হইতে

দুধ ঝরিয়া স্থানটি ধৌত হইল। রক্ষক বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলেন যে শিব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, যে প্রস্তরে গাভীর দুধ ঝরিতেছিল উহাতে তিনি অবস্থান করিতেছেন এবং উহার নাম স্বয়ম্ভূনাথ। পরদিন হইতে তিনি স্বয়ম্ভূনাথের পূজার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে স্বয়ম্ভূনাথের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া ত্রিপুরেশ্বর ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় স্বয়ম্ভূনাথের চারিদিকে খনন করাইয়া বিফল হন ; যতই খনন করা যায় কিছুতেই আর শেষ হয় না। হস্তীর দ্বারা উঠাইবার চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। রাত্রিকালে স্বপ্নাদেশ হয়, তিনি যেন স্বয়ম্ভূনাথকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার আশা ত্যাগ করেন এবং ইঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিকটস্থ মহামায়া মূর্ত্তিকে লইয়া যান। রাত্রিকালে মহামায়াকে লইয়া যাইয়া যেখানে রাত্রি প্রভাত হয় সেই স্থানেই যেন তাঁহাকে স্থাপন করেন। ত্রিপুরেশ্বর তখন স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া পূজার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন এবং আদ্যাশক্তি মহামায়াকে লইয়া পার্ব্বত্য পথে রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। রাজধানী হইতে বহুদূরে যেখানে প্রভাত হইল, সেইখানে দেবীকে স্থাপন করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের নামানুসারে মহারাজ দেবীর নাম রাখিলেন ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরী এবং এই স্থানে সূর্য্য উদয় হওয়ায় জায়গাটির নাম রাখিলেন উদয়পুর। উদয়পুর একটি পীঠস্থান, সতীর দক্ষিণ চরণ এখানে পতিত হইয়াছিল। (কুমিল্লা দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ম্ভূনাথ মন্দির হইতে চন্দ্রনাথের পথ ধরিয়া দু' তিন শ ফুট যাইয়া বাম দিকে ৮০টি সোপান অবতরণ করিয়া গয়াকুণ্ড বা পদগয়ায় যাইতে হয়। যাঁহারা পিণ্ডদানাদি না করেন তাঁহারা এখানে না গিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। কিছুদূর গিয়া ১৫৭ টি সোপান অতিক্রম করিয়া দুইটি রাস্তার সঙ্গম স্থলে আসিতে হইবে। এখানে দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র সেতু পার হইয়া সোজা চন্দ্রনাথ শিখরে উঠিবার ৫৪৯ টি সোপান পড়িবে, এই পথটি সমস্তটাই অত্যন্ত খাড়াই এবং পথে উনকোটি শিব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পড়িবে না। নামিবার পক্ষে এই পথ সুবিধার। সুতরাং এই পথে না উঠিয়া বাম দিকে ৮টি সিঁড়ি পার হইয়া উত্তর মুখে উনকোটি শিব ও বিরূপাক্ষ হইয়া চন্দ্রনাথ শিখরে পৌছাইয়া প্রথমোক্ত পথ দিয়া নামিয়া আসাই বাঞ্ছনীয়।

উনকোটি শিবের পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইলেই দক্ষিণদিকের পর্ব্বতটি ঠিক যেন একটি গোলাকার বৃহৎ ছত্রের আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে ছত্রশিলা বলে। ছত্রশিলার পরেই রাস্তার বামদিকে একটি বিশাল প্রাচীন বৃক্ষের পাদদেশ প্রকাণ্ড কোটরের আকার ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ পূর্ব্বকালে মহর্ষি কপিল এই কোটরে তপস্যা করিতেন এই জন্য ইহা কপিলাশ্রম নামে অভিহিত। কপিলাশ্রম হইতে কিছুদূর যাইলে পথ একটি ছোট পর্ব্বত গুহায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এই গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গাকৃতি অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বতগাত্রে ও গুহার ছাদে সংলগ্ন আছে; অভ্যন্তর হইতে অবিরত জল নিঃসৃত হইয়া এইগুলিকে ধৌত করিতেছে। ইহাই উনকোটি শিব নামে খ্যাত।

উনকোটি শিব দেখিয়া কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া বামদিকে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দিরের পথ। পথটি দুর্গম, তবে আজকাল পথের নানা স্থানে সিঁড়ি ও রেলিং নির্ম্মিত হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুগম হইয়াছে।

বিরূপাক্ষ হইতে চন্দ্রনাথ মহাদেবের মন্দির বেশী দূর নয়, পথও সহজ। পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছাড়াইয়াই বর্ত্তমান মন্দির। সমতলভূমি হইতে পাহাড়ে উঠিতে নানা স্থান হইতে এবং

ঊনকোটি শিবের পথে (পৃষ্ঠা ১৭২)

চন্দ্রনাথের মন্দির (পৃষ্ঠা ১৭৩)

বিরূপাক্ষ ও চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দৃশ্য উদার ও মনোরম। বিশেষ করিয়া চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহার তুলনা বাংলাদেশে নাই। এক দিকে ৪ মাইল দূরের বঙ্গোপসাগর ও সন্দীপ দ্বীপটি ও অপর দিকে তরুরাজি শোভিত পর্ব্বতমালার গম্ভীর রূপটি অতি অপূর্ব্ব ও মহান্। পর্ব্বত ও সমুদ্রের এই সম্মিলিত রূপ সকলকেই মুগ্ধ করিবে।

বিরূপাক্ষ হইতে চন্দ্রনাথ শিখরের পথ হইতে পাতালপুরী তীর্থে যাওয়া যায়, পথ ছাড়িয়া প্রায় দুই তিন মাইল পার্ব্বত্য পথ ও সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানে বৃষেশ্বর শিব, গোপেশ্বর শিব, পঞ্চানন শিব, বুড়েশ্বর শিব, পাতাল কালী, হরগৌরী, দ্বাদশ শালগ্রাম, পাতাল গঙ্গা, মন্দাকিনী প্রভৃতি অনেক দেবদেবী আছেন। সকল তীর্থযাত্রী পাতালপুরী দর্শন করেন না।

শিবরাত্রির সময়ে চন্দ্রনাথে মহামেলা হয়। তখন বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এখানে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়।

অন্যান্য তীর্থের ন্যায় চন্দ্রনাথেও বহু পাণ্ডা আছেন; সীতাকুণ্ড ষ্টেশনের নিকটেই অনেকের বাড়ী।

চন্দ্রনাথ পাহাড় বৌদ্ধগণের নিকটেও বিশেষ পবিত্র। প্রবাদ বুদ্ধদেবের অঙ্গুলির অস্থি এই পর্ব্বতের শিখরে সমাহিত আছে। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পিছন দিকে একটি প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে বলিয়া দেখানো হয়। অনেকে অনুমান করেন পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে চন্দ্রনাথে বৌদ্ধগণের একটি মেলা হয়।

বুদ্ধকূপ নামে একটি কুণ্ডের মধ্যে মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

বাড়বাকুণ্ড—সীতাকুণ্ডের পরের ষ্টেশন। ইহা লাকসাম জংশন হইতে ৬১ মাইল দূর। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে বাড়বানল পাহাড় অবস্থিত। এখানে শিব, কালী, ভৈরব ও ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে হয়। এখানকার বাড়বাকুণ্ড নামক কুণ্ডের জলের উপর সতত একটি অগ্নিশিখা ক্রীড়া করিতেছে দেখা যায়। উহা মহাদেবের তৃতীয় নেত্র বা জ্যোতির্ময় নামে বিখ্যাত। বাড়বাকুণ্ডের জল উষ্ণ। নিকটেই বাসিকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। বাড়বাকুণ্ডের বাড়তি জল উপচাইয়া গিয়া এই কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। ইহার জল শীতল। বাড়বাকুণ্ডের আয়তন ৪×৪×৩ হাত। ইহা অতলস্পর্শী এবং ইহার তলদেশ লোহার পাত দিয়া বাঁধানো।

শিবরাত্রির সময় বহু যাত্রী বাড়বানল দর্শন করিয়া থাকেন।

কুমিরা—লাকসাম হইতে ৬৬ মাইল। ষ্টেশন হইতে পার্ব্বত্য পথে এক মাইল দূরে কুমারীকুণ্ড অবস্থিত। ইহা চারি হস্ত পরিমিত একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড এবং বাড়বাকুণ্ডের ন্যায় অতলস্পর্শী। ইহার উপরও মাঝে মাঝে অগ্নি খেলিয়া যায়, বাড়বের অগ্নির ন্যায় উহা অবিশ্রান্ত নয়। নিকটে কুমারী দেবী অবস্থিতা।

কুমিরার সম্মুখেই বঙ্গোপসাগর ও সন্দীপ দ্বীপ। পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের সময় বহুলোক এই স্থান হইতে পলাইয়া যায়। এই গ্রামের প্রধান জমিদার "নানক সাহাজী" ও তাঁহার বংশীয়েরা গুরু নানকের বংশ সম্ভূত বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।

কৈবল্যধাম—লাক্সাম জংশন ও চট্টগ্রাম হইতে যথাক্রমে ৭৪ ও ৪ মাইল। এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর "কৈবল্যধাম" নামে একটি আশ্রম ও কৈবল্যনাথ নামক মহাদেব আছেন। দুর্গাপূজার সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। আশ্রম ও মন্দির ট্রেন হইতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও পাহাড়তলী হইতে মোটর বা ঘোড়ার গাড়ীতেও যাওয়া চলে। পাহাড়তলী স্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মাত্র দেড় মাইল পথ।

পাহাড়তলী—লাকসাম জংশন হইতে ৭৮ মাইল দূরে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানে আসাম-বাংলা রেলপথের গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানা আছে। এখানকার পাহাড়ে ঘেরা লেক্ বা হ্রদ একটি বেড়াইবার জায়গা। এই হ্রদটি পানীয় জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্টেশনের নিকটে ভেলুয়ার দীঘির সহিত একটি পুরাতন কাহিনী জড়িত। দিল্লীতে দাসবংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশ হইতে আমীর সওদাগর নামে একজন বণিক তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী ভেলুয়াকে লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং কর্ম্মসূত্রে চট্টগ্রামে তাঁহার সমব্যবসায়ী স্থানীয় ভোলা সওদাগরের সংস্পর্শে আসেন। ভোলা ভেলুয়ার রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয় এবং এক দিন ভেলুয়া যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে হরণ করে। আমীর সওদাগর বাংলার নবাবের সাহায্যে অনেক দিন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া বাহুযুদ্ধে ভোলাকে নিহত করিয়া পত্নীর উদ্ধার করেন। এই ঘটনার স্মৃতিকল্পে ও পত্নীর সম্মানের জন্য নিহত ভোলার বাস্তুভিটায় একটি প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়াছিলেন। তখনকার গ্রাম্য কবিরা ভেলুয়া রহরণ বৃত্তান্ত লইয়া সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম—লাক্সাম জংশন হইতে ৮১ মাইল। বিভাগ ও জেলার প্রধান শহর চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। কর্ণফুলী নদী পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া চট্টগ্রাম শহরের নিকটেই বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। বৎসরের সকল সময়েই এই নদী দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। বাংলাদেশে কলিকাতার পর চট্টগ্রামই একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর। ইহা একটি আদর্শ ও স্বাভাবিক বন্দর এবং ইহার জল-বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ। চট্টগ্রামের জেটিসমূহ আসাম-বাংলা রেলপথ কর্ত্তৃক বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা চট্টল নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন চট্টভট্ট জাতি চট্টলের প্রাচীন অধিবাসী, সেই জন্য ইহার নাম চট্টল বা চট্টগ্রাম হয়। কেহ বা বলেন সপ্তগ্রাম অঞ্চল হইতে বহুলোক এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহারা এই স্থানের নাম সপ্তগ্রাম রাখেন। পরে এই নাম বিকৃত হইয়া চপ্টগ্রাম ও তাহা হইতে চট্টগ্রাম হয়। স্থানীয় বাঙালী বৌদ্ধগণের অনেকে বলেন যে পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বহু চৈত্য বা বৌদ্ধ মঠ ছিল বলিয়া ইহার নাম চৈত্যগ্রাম হয়। চৈত্যগ্রাম পরে চট্টগ্রামে রূপান্তরিত হয়। আরাকানী ও মগেরা ইহাকে চাটিগা বলিত। আরাকানী ইতিহাসে ইহাকে চাইতিগাঁও বা যুদ্ধলব্ধ গ্রাম এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ আরাকানের অপর নাম ছিল চাইতে-গ্রাও বা যুদ্ধলব্ধ নগরী। অনেকে অনুমান করেন, এই চাইতিগাঁও হইতেই চাটিগাঁ হইয়াছে। খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে এ অঞ্চল বৌদ্ধজগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং সুদূর তিব্বত হইতেও কতিপয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শিক্ষালাভার্থ এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সে দেশেও ইহার নাম

চাটিগাঁ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা ইহাকে আরবী অক্ষরে "ছতের কাওন" লিখিয়াছেন।

এইরূপ গল্পও প্রচলিত আছে যে প্রসিদ্ধ পীর বদর সাহেব এখানে আসিয়া রাজার নিকট হইতে এক চাটি (অর্থাৎ প্রদীপে যতটুকু স্থান আলোকিত হয়) ততটুকু স্থান প্রার্থনা করিয়া লইয়া একটি পাহাড়ের উপর তাঁহার প্রদীপ স্থাপন করেন। যতদূর প্রদীপের আলো পড়িয়াছিল তাহারই নাম চাটি-গাঁ হয়। এখনও শহরের মধ্যে "চেরাগী পাহাড়ে" প্রদীপের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এই চাটিগাঁ ক্রমে চাটিগ্রাম ও চট্টগ্রামে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। এই গল্পের সামান্য প্রকার ভেদ এইরূপ, যে পূর্ব্বে এই অঞ্চল দৈত্য ও পরীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ছিল; মুসলমানগণ গৌড় জয় করিলে বার জন আউলিয়া বা সিদ্ধ ফকির এখানে আসিয়া একটি পাহাড়ের উপর প্রদীপ জ্বালিয়া দৈত্য ও পরীদের দমন করেন। প্রদীপ বা চাটির প্রভাবে এই স্থান লোকের বাসোপযোগী হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হয় চাটিগাঁ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চট্টগ্রামের নাম চাটিগ্রাম। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ইহাকে বলিতেন রম্যবতী। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করিয়া মুসলমানগণ ইহার নাম রাখেন ইস্লামাবাদ। ফকির দরবেশের নিকট ইহা "বার আউলিয়ার দেশ" নামে পরিচিত ছিল। পর্ত্তুগীজগণ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "পোর্টোগ্রাণ্ডো" বা বড় বন্দর; তাঁহারা সপ্তগ্রামকে বলিতেন "পোর্টোপিকুইনো" বা ক্ষুদ্র বন্দর।

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে চট্টগ্রাম বহুবার হিন্দু ত্রিপুরারাজ ও বৌদ্ধ আরাকানরাজের শাসনাধীন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও আরাকানের বৌদ্ধ রাজা মুসলমানদের নিকট হইতে ইহা জয় করেন। কথিত আছে তিনি বলিয়াছিলেন "চিৎ-ত-গং" অর্থাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়। আরাকানি ও মগেরা বলেন এই উক্তি হইতেই চট্টগ্রাম শহরের নাম হইয়াছে চিটাগং।

চট্টগ্রাম শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। শহরের মধ্যে নানাস্থানে উচ্চ টিলা ও পাহাড় থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী আফিস আদালত, য়ুরোপীয় ক্লাব, আসাম বাংলা রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস-ভবন এইরূপ উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই সকল পাহাড় হইতে জাহাজ, স্টীমার ও সাম্পান নৌকা পরিপূর্ণ কর্ণফুলী নদী ও অনতিদূরবর্ত্তী সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বিশেষতঃ জ্যোৎস্না রাত্রিতে ইহার সৌন্দর্য্য হইয়া উঠে অতি মনোরম।

শহরের একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর চট্টগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চট্টেশ্বরী কালীর মন্দির অবস্থিত।

শহরের মধ্যে "পীর বদরউদ্দীন সাহেবের দরগাহ্" অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ হজরৎ শাহজলাল কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজয়ের পর তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সেনাপতি নাসিরউদ্দীন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য তরফ জয় করেন। তাহার সহিত যে চারজন আউলিয়া বিজিত ভূমিতে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গিয়াছিলেন তাঁহারা তরফ জয়ের পর নিকটস্থ নানাস্থানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। ইঁহাদেরই অন্যতম পীর বদরউদ্দীন চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকে এই দরগাহে "শিরণি" দিয়া থাকেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িবার সময় "বদর, বদর" উচ্চারণ করিয়া এই পীরের জয়ধ্বনি করে।

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরলোকগত রায় সাহেব প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে শহরের মধ্যে একটি সপ্ততল বিশিষ্ট নবগ্রহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে নবগ্রহের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের উপর হইতে শহর ও কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য অতি সুন্দর।

শহরের অন্দরকিল্লা পল্লীতে অবস্থিত "জামে মস্‌জিদ" অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। লালদীঘি নামক একটি সরোবরের উত্তর তীরে একটি পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। ১০৭৮ হিজিরায় নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র নবাব খাঞ্জা উমেদ খাঁ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদটি দেখিতে একটি দুর্গ বা কেল্লার মত বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে অন্দর কিল্লা।

চট্টগ্রামের শহরতলীতে একটি পাহাড়ের সানুদেশে সুবিখ্যাত পীর সুলতান বায়েজিদ্‌ বস্তামী সাহেবের দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহ ও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানিত। এখানকার মস্‌জিদের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর মধ্যে বহু কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা নির্ভয়ে দর্শকগণের হস্ত হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম শহরের অপরাপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিক্যাল স্কুল, বৌদ্ধবিহার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টল শাখার নাম উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ বহু বৈষ্ণব ভক্তের চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম হইয়াছিল। আধুনিক যুগে চট্টগ্রাম সুপ্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ও শশাঙ্কমোহন সেন এবং স্বর্গীয় জননায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জন্মভূমি বলিয়া বাঙালীর নিকট সুপরিচিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল চট্টগ্রামে সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এই সিপাহীদলকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ কর্ত্তৃপক্ষ পান নাই। বস্তুতঃ ১৩ই জুন তারিখের রিপোর্টে বিভাগীয় কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেব লিখিয়াছিলেন যে যদিও দিল্লীতে বিদ্রোহের জন্য সাধারণের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের সিপাহীরা অবিশ্বাসের কোনও কার্য্য করে নাই। বরং তাহারা দিল্লী যাইয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ব্যগ্র ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট হেন্‌ডারসন সাহেবের ১৯এ জুন তারিখের রিপোর্টে দেখা যায় যে যদিও তাঁহার মতে বিদ্রোহের ভয় অমূলক, তথাপি নাগরিকেরা বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেকেই ভয়ে সমুদ্রে জাহাজে যাইয়া অবস্থান করিতেছিল। অবশেষে ১৮ই নবেম্বর রাত্রি ১১টার সময়ে সত্যই সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া কারাবাসীদের মুক্তি দিয়া রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গোলাগুলিসহ উত্তরদিকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে চলিয়া যায়। বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে তাহারা কোথাও কোনরূপ অত্যাচার করে নাই এবং অরক্ষিত অবস্থায় স্থানীয় লোকের দ্রব্যাদিও অপহৃত হয় নাই। কারামুক্ত কয়েদী ও স্ত্রী পুত্রসহ তাহারা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শত ছিল। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ৩৫৪ জন গোরা সৈন্য ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছিয়া ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সিপাহীরা জঙ্গলে আশ্রয় লওয়ায় তাহারা ঢাকায় ফিরিয়া আসে। সিপাহীদের ধরিবার জন্য ৫ পাউণ্ড করিয়া পুরস্কার ঘোষিত হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছিল চট্টগ্রামে তাহাদের ফাঁসী দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর (পৃষ্ঠা ১৭৪)
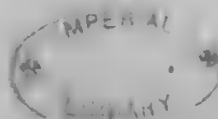
নবগ্রহ মন্দির, চট্টগ্রাম, (পৃষ্ঠা ১৭৬)

আদিনাথের মন্দির (পৃষ্ঠা ১৭৭)

সমুদ্রতট, কাক্সবাজার (পৃষ্ঠা ১৭৮)

মির্জ্জারখাঁনি মসজিদ্ (পৃষ্ঠা ১৭৯)

আদিনাথ—চট্টগ্রাম হইতে স্টীমারযোগে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ আদিনাথ যাইতে হয়। ইহা মহিষখালি বা মহেশখালি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহানার কাছেই মহিষাখালি বা মহেশখাল নামক দ্বীপে মৈনাক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সমতল ভূমি হইতে ৬৯টি সোপান অতিক্রম করিয়া মৈনাকের শীর্ষদেশে আদিনাথ শিবের মন্দিরে পৌঁছিতে হয়।

চট্টগ্রাম হইতে আদিনাথের দূরত্ব ৭৫ মাইল, স্টীমারে করিয়া যাইতে প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে। কর্ণফুলী নদী বাহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়া বামদিকে গজিরার বাতিঘর ছাড়িয়া বাহির সমুদ্রে কিছুক্ষণ যাইবার পর কুতুবদিয়া দ্বীপের নিকট সমুদ্র ফেলিয়া স্টীমার নদী ও খাল দিয়া অগ্রসর হয়। কুতুবদিয়া মাতামুড়ী নামক নদীর মোহানায় অবস্থিত। এই দ্বীপের বাতিঘর বহুক্ষণ ধরিয়া দেখা যায়। স্টীমার ক্রমে মহিষখালি নদীতে গিয়া পড়ে এবং বঙ্গোপসাগরের সহিত এই নদীর সঙ্গমের কিছু আগেই মহিষখালি দ্বীপে আদিনাথের মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে সামপান যোগে কূলে যাইতে হয়; নৌকায় মাত্র ১০।১৫ মিনিট সময় লাগে।

শিবরাত্রির পরই বহু লোক চন্দ্রনাথ হইয়া আদিনাথ মহাদেবের দর্শনে আসেন। এই সময়ে এখানে ৮ দিন ধরিয়া মেলা বসে। এই মেলা প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

এই তীর্থে আদিনাথ মহাদেব ও অষ্টভুজা দুর্গা মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়, নদী ও সম্মুখে সমুদ্র পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে সত্যই মনোরম করিয়াছে; এই স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে প্রাত্যহিক সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি তীর্থযাত্রীর মনে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করে।

আদিনাথ রাবণের কাঁধে চড়িয়া তাঁহার বাসাবাটী মৈনাকে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তিনি বহুকাল গুপ্ত অবস্থায় ছিলেন। কিংবদন্তী প্রায় ২০০ বৎসর হইল স্থানীয় কোনও মুসলমান কৃষক কাঠ কাটিবার জন্য জঙ্গলে গিয়া একটি বেলগাছে উঠিতে গেলে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া যায়। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন ইহা একটি সুন্দর পাথরের টুকরা। অস্ত্র শান্ দিবার জন্য তিনি ইহা কুড়াইয়া বাড়ী লইয়া যান এবং দুই পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল বলিয়া পাথরটি দিয়া দুই পা ঘর্ষণ করেন। রাত্রে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী নানারূপ ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হন। পরের দিন তাঁহাদের একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কৃষক ভীত হইয়া মহিষখালির জমিদার প্রভাবতী ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি কৃষকের নিকট হইতে আদিনাথকে লইয়া আসিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করেন।

মহিষখালি দ্বীপে বহু মগ বাস করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রহ্ম ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মরাজভীত বহু আরাকানবাসী চট্টগ্রাম জেলার প্রান্তদেশে স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মহেশখালির মগেরা তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততি। ইঁহারা নিজ ভাষা ভিন্ন বাংলাও জানেন। আদিনাথ মন্দিরের নিকটেই একটি সুন্দর ছোট বৌদ্ধ মন্দির এবং আধ মাইল দূরে ইহাদের পূজাস্থান চেরাংঘর দেখিবার জিনিস। চেরাংঘরের তিন চারিটি মন্দিরে বহু সুন্দর ও বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত পাথর ও পিতল ইত্যাদির বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা হয়। বাংলাদেশে অন্য কোথাও এরূপ সুন্দর বৃহৎ মূর্ত্তি নাই।

কাক্সবাজার—চট্টগ্রাম হইতে জলপথে আদিনাথের ঠিক পরের স্টীমার স্টেশন কাকসবাজার (Cox's Bazar)। এই স্থান আদিনাথের সামান্য দক্ষিণে মহিষখালি নদীর অপর

পারে ঠিক বঙ্গোপসাগরের মোহানার উপর অবস্থিত। স্টীমার হইতে সাম্পানে নামিয়া তিন মাইল পথ একটি বৃহৎ খাল দিয়া কাক্সবাজারে যাইতে হয়। কাক্সবাজারের উত্তরে এই খাল এবং পশ্চিমে সমুদ্র। যাঁহারা জলপথে যাইতে অনভ্যস্ত তাঁহারা কেহ কেহ সমুদ্রের ঢেউ খাইয়া সাম্পানে কাক্সবাজার যাইতে ভয় পাইতে পারেন—বিশেষতঃ শীতকালের পর যখন স্বভাবতই বাতাসের জন্য সমুদ্রে ঢেউ বেশী থাকে।

শিবরাত্রির পর আদিনাথ দর্শন করিয়া কেহ কেহ জাহাজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৌকাযোগেই মহিষখালি নদী পার হইয়া কাক্সবাজার যাইয়া থাকেন; ইহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। এই পথেও মাঝ নদীতে বেশ ঢেউ লাগে, সুতরাং অনভ্যস্তের পক্ষে স্টীমারে যাওয়াই বিধেয়।

কাক্সবাজার চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম মহকুমা; এবং চট্টগ্রাম শহর হইতে দক্ষিণে স্থল পথে মাত্র ৪৯ মাইল দূর; কিন্তু রাস্তা নাই। শহরটির দৃশ্য বড়ই সুন্দর, বিশেষতঃ ইহার বিস্তৃত সমুদ্রতটটি অতি মনোরম।

এখানে সামুদ্রিক মৎস্যের বড় কারবার আছে এবং এখানকার প্রস্তুত লুঙ্গি কাপড়ের বিশেষ চাহিদা আছে।

মহিষখালির ন্যায় কাক্সবাজারেও ব্রহ্ম-আরাকাণ যুদ্ধের পর হইতে বহু মগ আসিয়া বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম অভিযানের প্রধান নেতা কাক্স্ সাহেবের নাম হইতে এই শহরের নামকরণ হইয়াছে।

সন্দ্বীপ—চট্টগ্রাম হইতে জাহাজযোগে বঙ্গোপসাগরের মোহানায় অবস্থিত সন্দ্বীপে যাওয়া যায়। সন্দ্বীপ নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি মুন্সেফী আদালত আছে। পাঠান আমলের শেষভাগে সন্দ্বীপ আরাকানী, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যু বা বোম্বেটেগণের একটি আড্ডা হইয়া উঠে। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া জলদস্যুগণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে নানা প্রকার অত্যাচার করিত। ষোড়শ শতাব্দীতে সিবাস্টিয়ান গঞ্জালিশ নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ্ সর্দ্দার সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। পরে পর্ত্তুগীজগণ মুঘলদিগের হস্তে পরাজিত হয়।

পূর্ব্বকালে সন্দ্বীপ জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে যে আলেক্জান্দ্রিয়ার সুলতান এখান হইতেই তাঁহার জাহাজগুলি নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন। সে যুগে সন্দ্বীপে বিস্তৃত লবণের কারখানা ছিল। সন্দ্বীপ একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

রাঙামাটি—চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নামক একটি স্বতন্ত্র জেলা আছে। এ জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চাক্মা ও মগ এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী টিপ্‌রা জাতিই অধিক। এ জেলায় রাস্তার বড়ই অভাব। এখানকার ভূমি পাহাড়পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার জঙ্গলে তুন, জারুল, চাপলাইস্ ও গর্জন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ এবং বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অরণ্যমধ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষ প্রভৃতি বাস করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপাস ও তুলা প্রধান।

এই জেলার প্রধান শহরের নাম রজমতী বা রাঙামাটি। শহরটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত এবং জলপথে চট্টগ্রাম হইতে ৬৫ মাইল দূর। স্টীমলঞ্চে একদিনে এবং নৌকাযোগে দুইদিনে যাওয়া যায়। পথটি বড়ই রমণীয়। ভ্রমণকারীদিগের অবস্থানের জন্য রাঙামাটিতে একটি সুসজ্জিত সার্কিট হাউস আছে।

রাঙামাটি শহরে চাক্‌মা জাতীয় জনৈক রাজার প্রাসাদ অবস্থিত।

নূতনপাড়া—চট্টগ্রাম জংশন হইতে আসাম বাংলা রেলপথের এক শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী নাজরিহাট ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনে নূতনপাড়া স্টেশন চট্টগ্রামের শহরতলিতে অবস্থিত। এই স্টেশনের অর্দ্ধ-মাইল পশ্চিমে পীর সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী সাহেবের দরগাহ অবস্থিত; ইহার কথা আগে বলা হইয়াছে।

নাজিরহাট ঘাট—চট্টগ্রাম নাজিরহাট ঘাট শাখা লাইনের শেষ স্টেশন। ইহার নিকটেই মাইজভাণ্ডার গ্রামে প্রসিদ্ধ পীর হজরত মৌলানা সৈয়দ গোলাম রহমান শাহ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা সুদূর আফগানিস্থান, ইরান্ ও আরব পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক বৎসর হইল তিনি পরলোকে গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র সমাধি দেখিতে প্রত্যহ অসংখ্য লোক আসিয়া থাকেন।

ধলঘাট—চট্টগ্রাম জংশন হইতে অপর একটি শাখা লাইন ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী দোহাজারী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনের মাঝপথে ধলঘাট স্টেশন। ধলঘাট হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে করলডেঙ্গা পাহাড়ে মেধস্ আশ্রম অবস্থিত। কিংবদন্তী, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ চণ্ডীর বক্তা মেধস্ মুনি এই এই স্থানে দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার সময় মেধস্ মুনির স্মরণার্থে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বহুলোক যোগদান করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া কথিত।

দোহাজারি—চট্টগ্রাম-দোহাজারি শাখা লাইনের শেষ স্টেশন। এখান হইতে দুর্গম পর্ব্বত ও গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া আকিয়াবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারের একটি পরিকল্পনা আছে। দোহাজারি স্টেশনের নিকটে অবস্থিত মির্জ্জারখীল গ্রামে হজরত জাহাঙ্গীর শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য দেশ বিদেশের মুসলমান সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। প্রতিবৎসর ১৭ই জেলহজ্জ তারিখে তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে মির্জ্জারখীল গ্রামে সপ্তাহব্যাপী উৎসব হয় এবং জাতি-ধর্ম্মনির্বিবশেষে বহুলোক ইহাতে যোগদান করেন।
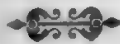
(গ) আখাউড়া-বদরপুর-শিলচর

ইটাখোলা—আখাউড়া জংশন হইতে ২৩ মাইল। ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত। স্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল পশ্চিমে বেজোড়াগ্রাম। ইহার সহিত একটি করুণ ঘটনার স্মৃতি জড়িত। পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে তরফ নামে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তরফের মুসলমান রাজা মেকায়েলের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আব্বাস দিল্লীতে গিয়া বীরত্ব ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এক ওমরাহ কন্যাকে বিবাহ করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে শ্রীহট্টে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঈর্ষান্বিত হইয়া বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। তাঁহার স্ত্রী মর্ম্মাহত হইয়া ঐ স্থান হইতেই দিল্লীতে ফিরিয়া যান। এই ঘটনায় স্বামী হইতে স্ত্রী চিরকালের জন্য বিযুক্ত হইয়া পড়েন বলিয়া স্থানটি আজও বেজোড়া নামে পরিচিত।

তরফের শেষ হিন্দু রাজার নাম আচক নারায়ণ; প্রবাদ তিনি হঠাৎ রাজ্যলাভ করেন বলিয়া আচক বা আচম্বিত নামে পরিচিত হন। আচক নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বরের করদ রাজা ছিলেন। রাজপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বিষয়ে নানা গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রত্যহ দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া রাজধানী হইতে বহু দূরে পবিত্র বরচক্র বা বরাক নদে স্নান করিতে যাইতেন। যে ঘাটে তিনি স্নান করিতেন তাহা আজও স্নানঘাট নামে অভিহিত। জনশ্রুতি যে পৌরাণিক কালের রাজা ভগদত্ত শাসনকার্য্য উপলক্ষে শ্রীহট্টে আসিলে এই ঘাটে স্নান করিতেন। আচক নারায়ণ স্নান করিয়া ফিরিয়া রাজধানী হইতে তিনক্রোশ দূরে স্থিত কীর্ত্তনীয়া টিলা নামক একটি নির্জ্জন টিলায় পূজা করিতেন। রাজবাটীতে কুলদেবতার ভোগ আরম্ভ হইলে একটি প্রকাণ্ড ঢাক বাজাইলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় তাহার উচ্চধ্বনি কীর্ত্তনীয়া টিলা হইতে শুনিতে পাইতেন। তখন তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। আচক নারায়ণ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ রাজা গৌড়গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ পীর শাহজলালের নেতৃত্বে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট জয় করিলে পর তাঁহারই আদেশে সেনাপতি নসিরউদ্দীন চারজন আউলিয়ার সহযোগিতায় তরফ আক্রমণ করেন। আচক নারায়ণ রাজা গৌড়গোবিন্দের পরাজয়ের খবর পাইয়া এবং তাঁহার অশিক্ষিত সৈন্যগণ সুশিক্ষিত মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে পারিবে না এবং কেবল লোকক্ষয় হইবে, এই ভাবিয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং পরিজনসহ ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুরায় অবস্থান করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া পরে তিনি মথুরা তীর্থে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নসিরুদ্দিন তরফের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তরফ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই রাজ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রমণের সময় দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম শাহবাজী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আচক নারায়ণের অশ্বের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "ইস্ তরফ যাও"। তদবধি এই অঞ্চলের নাম তরফ হইয়াছে। নসিরুদ্দিনের প্রপৌত্র সৈয়দ শাহ ইসরাইল বিদ্যাবত্তার জন্য মুলক-উল-উলামা উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ইরাণী ভাষায় তিনি "মদানেল ফাওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে)। তরফরাজগণ দিল্লীর অধীন হইলেও ত্রিপুর রাজগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। তরফরাজ সৈয়দ মুসার সহিত আরাকান রাজ্যের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। আরাকান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের উৎসাহে বঙ্গীয় কবি আলাওল

মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট (পৃষ্ঠা ১৮৭)
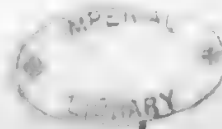
একটি নাগা পরিবার (পৃষ্ঠা ১৯২)

সাহেব ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। সৈয়দ মুসার অনুরোধে এই কবি "সায়ফল মুলুক" ও "বদিউজ্জমাল" নামক ইরাণী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদ কার্য্য মাগনঠাকুরের মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়।

শাহাজীবাজার—আখাউড়া জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। ইহা শ্রীহট্ট জেলার প্রাচীন তরফ রাজ্যের অন্তর্গত। স্টেশনের নিকটেই ফতেপুর নামক গ্রামে রঘুনন্দন পাহাড়ের উপর বিখ্যাত ফকির ও দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম শাহ ফতে গাজীর দরগাহ ও কবর অবস্থিত। স্থানটি মুসলমানগণের নিকট বিশেষ পবিত্র। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিনে গাজীর স্মরণার্থ এখানে একটি মেলা হয়। রঘুনন্দন পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ উচ্চতায় ৭০০ ফুট।

শায়েস্তাগঞ্জ জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ৪৬ মাইল দূর। কেহ কেহ বলেন যে প্রাচীন তরফ রাজ্যের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশীয় হাদিদ রাজার পুত্র সৈয়দ শায়েস্তা মিয়া এই স্থানে একটি বাজার বসাইয়া স্বীয় নামানুসারে উহার শায়েস্তাগঞ্জ নাম রাখেন। মতান্তরে, বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ এই গঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। শায়েস্তা খাঁ মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন।

স্টেশনের নিকটেই দাউদ নগরের দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহের প্রাচীন জলাশয়ে বহু গজাল মাছ ভাসিতে দেখা যায়। ইহা প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম সৈয়দ শাহ সয়েফ্ মিল্লত উদ্-দীনের প্রপৌত্র প্রসিদ্ধ শাহ দাউদ সাহেবের দরগাহ। দাউদ সাহেবের বাসস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম হয় দাউদনগর।

শায়েস্তাগঞ্জের নিকটে খোয়াই নদীর তীরস্থ বৃহদাকৃতি "তুঙ্গেশ্বর" মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এখানে সতীর নয়টি অঙ্গুরীয়ক পতিত হইয়াছিল; সেই জন্য এই স্থান নবরত্ন উপপীঠ নামে পরিচিত। তুঙ্গেশ্বর মহাদেবের কোন মন্দির নাই। প্রবাদ একবার মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন হইলে পূজারী স্বপ্ন দেখেন যে মহাদেব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন যে তিনি মন্দিরে থাকিতে ভালবাসেন না। জনশ্রুতি, যে প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে শম্ভুনাথ বাচস্পতি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই শিবের প্রকাশ করেন। ইহার সম্বন্ধেও কপিলা গাভীর দুগ্ধদানের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। লোকের বিশ্বাস এই শিব ক্রমশঃ বাড়িতেছেন; আটশত বৎসরে ইনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইতে প্রায় তিন হাত উচ্চ ও পাঁচ হাত পরিধিতে পরিণত হইয়াছেন। কালাপাহাড় তুঙ্গেশ্বরের দক্ষিণদিক নাকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শিবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া সেই ভগ্নস্থান নাকি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

শায়েস্তাগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন উত্তর-পশ্চিমদিকে আট মাইল দূরবর্ত্তী হবিগঞ্জ বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি শাখা লাইন দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বাল্লাবাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নরপতি—শায়েস্তাগঞ্জ জংশন হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৩ মাইল। তরফ রাজবংশের ইস্রাইল মুলক্-উল-উলেমার কথা আগে বলা হইয়াছে। ইহার পুত্র শাহ ইলিয়াস কুদ্দস বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। খোয়াই নদীর তীরে নির্জ্জনে তিনি সাধনা করিতেন। কিংবদন্তী

রাত্রিকালে একবার চন্দ্রকিরণের মত উজ্জ্বল জ্যোতি আকাশ হইতে তাঁহার কুটিরে প্রবেশ করে। তখন হইতে তিনি "কুতুব-উল-আউলিয়া" নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার বাসস্থানের নাম হয় "চন্দ্রচুরি"। মৃত্যুর পর তাঁহাকে নরপতির নিকটবর্ত্তী মুড়ারবন্দ নামক স্থানে খোয়াই নদীর তীরে সমাহিত করা হয়। এই স্থান "কুতুবের দরগাহ" বা "মুড়ারবন্দের দরগাহ" নামে অভিহিত। দরগাহটি দৈর্ঘ্যে সিকি মাইল। এই স্থানে আরও বহু পীর প্রভৃতির শতাধিক কবর আছে। বহু দূর হইতে মুসলমান ভক্তগণ এই দরগাহে জিয়ারত করিতে আসেন।

কুতব-উল-আউলিয়ার প্রপৌত্র গদাহাসনও একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। [পৈল দ্রষ্টব্য]।

হবিগঞ্জ বাজার—হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম মহকুমা ও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে একটি কলেজ আছে। এই স্থানও প্রাচীন তরফ রাজ্যের অন্তর্গত।

পৈল—হবিগঞ্জ স্টেশনের নিকটস্থ পৈল গ্রামের পীর বাদশাহের প্রাচীরবেষ্টিত দরগাহ সুপ্রসিদ্ধ। তরফের মুসলমান রাজবংশের প্রসিদ্ধ সাধক কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের প্রপৌত্র সৈয়দ নুরিও একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। তিনি পৈতৃক বাসস্থান নরপতি ছাড়িয়া পৈলে আসিয়া বাস করেন এবং দিল্লী হইতে নিজ নামে "নুরুল হাসান নগর" পরগণা খারিজ করিয়া লইয়াছিলেন। কথিত আছে, কুতুব-উল-আউলিয়ার পবিত্র সমাধির পার্শ্বে কাহার শব সমাহিত হইবে ইহা লইয়া সৈয়দ শাহ নুরির সহিত তাঁহার পিতৃব্যপুত্র বিখ্যাত সাধক গদাহাসনের বিবাদ ঘটে এবং মীমাংসার জন্য উভয়ে দিল্লী গমন করেন। দিল্লীশ্বরের বিচারে শাহ নুরিরই জয় হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নরপতির নিকটবর্ত্তী কুতুব-উল-আউলিয়ার কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সৈয়দ শাহ নুরির বংশের পীর বাদশাহ একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি ইরাণী ভাষায় "গঞ্জরাজ" নামক তত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পৈলে তাঁহার দরগাহ মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোকের বিশ্বাস যে অনাবৃষ্টির সময়ে পীর বাদশাহের কবরের উপর তাঁহার বংশজ কেহ যদি ১০১ কলসী জল ঢালেন তাহা হইলে বৃষ্টি হইবে।

পৈলের সৈয়দগণ বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। পীর বাদশাহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ইরাণ ভাষায় স্বপ্নফল সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই বংশের অনেকে দিল্লীর বাদশাহাজাদা-দিগের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। দিল্লী হইতে আগত শাহ আমন উদ্দীন নামক জনৈক বিদ্বান্ ব্যক্তি এই বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার বংশজ রেহান উদ্দীন ইরাণী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন, ইহার কবিতা শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট্ ইহাকে "বুলবুল বাঙ্গালা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিথঙ্গল—হবিগঞ্জ মহকুমায় স্থিত বিথঙ্গল গ্রামে শ্রীহট্ট জেলার বৃহত্তম বৈষ্ণব আখড়া অবস্থিত। এই আখড়ায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ গোসাইএর সমাধি আছে, কোনও মূর্ত্তি নাই। ইনি জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গৃহত্যাগী বৈরাগী এবং গুরুকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এক কালে ইহারা তুলসীপত্র বা গোময় ব্যবহার করিতেন না; এই কারণে বৃন্দাবনে নানারূপ আপত্তি উঠে। এখন ইহারা বৈষ্ণবদিগের সাধারণ রীতি অনেক মানিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জগন্মোহনের সমাধি হবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মসুলিয়া গ্রামে অবস্থিত। মসুলিয়ার আখড়া হইতে বিথঙ্গলের আখড়া অনেক বড়। এই আখড়ার বহু ভূসম্পত্তি আছে।

হবিগঞ্জ হইতে বিথঙ্গল প্রায় ১২ মাইল। শ্রীহট্ট হইতে স্টীমারযোগেও যাওয়া যায়।

বাণিয়াচঙ্গ—হবিগঞ্জ হইতে জলসুখা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে উহার উপর হবিগঞ্জ হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে বাণিয়াচঙ্গ অবস্থিত। ইহার পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। ইহাকে ভারতের বৃহত্তম গ্রাম বলিয়া দাবী করা হয়। বস্তুতঃ ইহা একটি নগরের সমান। ইহার চারিদিক পরিখা ও মাটির পাচীল দিয়া ঘেরা এবং দূর হইতে ইহাকে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত মনে হয়।

বাণিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে বাণিজ্য সূত্রে এ অঞ্চলে আগমন করেন বলিয়া কথিত। জনশ্রুতি যে একটি পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি লইয়া নৌকায় সাগর সমান হাওরে চলিতে চলিতে দেবীর দৈনিক পূজার জন্য শুষ্ক ভূমি না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়েন; এমন সময়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি ভূমি দেখিতে পাইয়া তথায় দেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া সে দিনের পূজা সমাপন করেন। কিন্তু তথা হইতে কালীমূর্ত্তিকে কিছুতেই উঠাইতে না পারায়, দেবীর ইচ্ছা মনে করিয়া তিনি ঐ স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশবের কর্ম্মচারী একজন বণিক জাতীয় বা বাণিয়া থাকায় এবং চঙ্গ জাতীয় মাঝি এই দুইটি মিলিয়া স্থানটির নাম বাণিয়াচঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কথিত। কেহ বা বলেন যে এই স্থানটি বাণিয়া বা ব্যবসায়ীর পক্ষে চঙ্গ অর্থাৎ সুন্দর এই ভাবিয়া বণিক কেশব মিশ্র এই স্থানটির নামকরণ করেন বাণিয়াচঙ্গ। কেশব মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে অনেক লোক আনাইয়া এই স্থানে বাস করিতে দেন এবং ক্রমে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই স্থানের রাজা হইয়া বসেন। কেশব মিশ্রের বংশের পদ্মনাভ রাজ্য অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বাণিয়াচঙ্গের প্রকাণ্ড পুষ্করিণী সাগরদীঘি তিনিই খনন করাইয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের জন্য এক হাজার দীঘি খনন করাইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন এবং মুক্ত হস্তে দানের জন্য তিনি আজও কর্ণ খাঁ নামে পরিচিত।

পদ্মনাভের একাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শক্তিমান গোবিন্দ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের উত্তরে শ্রীহট্টের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীন কালে লাউড় নামে রাজ্য অবস্থিত ছিল। লাউড় রাজবংশ লোপ পাইলে প্রজাগণ খাসিয়াদিগের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বাণিয়াচঙ্গ অধিপতি গোবিন্দ খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ খাঁ লাউড় অধিকার করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। খাসিয়ারা পাহাড়ে পলাইয়া যায়। গোবিন্দ খাঁ লাউড় রাজ্য ভোগ করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্য জগন্নাথপুরের রাজা জয়সিংহের বিবাদ বাধে। জগন্নাথপুর হবিগঞ্জের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে। জগন্নাথপুর ও লাউড় রাজবংশীয়দের মধ্যে কোন বিভাগ ছিল না। সুতরাং লাউড় রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জয়সিংহ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং দিল্লী গিয়া সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। সম্রাট সমস্ত শুনিয়া দূত পাঠাইয়া গোবিন্দ খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কথিত আছে গোবিন্দ খাঁ এই আজ্ঞা শুনিলেন না এবং দূত ক্রুদ্ধ গোবিন্দ খাঁর পদাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য দিল্লী হইতে সৈন্য আসিল। এই সময়ে গোবিন্দ খাঁ বাণিয়াচঙ্গের চতুর্দ্দিকে মৃৎপ্রাচীর তুলিয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সম্রাট-সেনাপতি গোবিন্দ খাঁকে পরাজিত করিতে না পারিয়া মণিকারের ছদ্মবেশে নিকটস্থ আজমীরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন এবং কৌশলে গোবিন্দ খাঁকে মণি দেখাইবার ছলনায় নিজ নৌকায় লইয়া আসিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যান। গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ

হয়। এই সময় ন্যায় বিচার প্রার্থী জয়সিংহও নজরবন্দী অবস্থায় দিল্লীতে ছিলেন এবং তিনি তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ সিংহ নামে লাউড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভুলক্রমে গোবিন্দ খাঁর স্থলে গোবিন্দ সিংহ বা জয়সিংহ নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এই ভুল ধরা পড়িলে, ইহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে মনে করিয়া সম্রাট গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলেন। গোবিন্দ খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নাম লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কথিত আছে বানিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই সময় হইতেই মুসলমান হন। তাঁহার স্ত্রী মর্ম্মাহত হইয়া রাজবাটী ছাড়িয়া অন্য একটি বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীর সম্মুখের দীঘি "ঠাকুরাণীর দীঘি" নামে আজও পরিচিত। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর রাণীর মনঃকষ্ট লাঘবের জন্য রাজা অধিকাংশ সময়ে বাণিয়াচঙ্গ হইতে দূরে লাউড়েই বাস করিতেন।

লাউড়ের জঙ্গলে বহু প্রকোষ্ঠ সহ একটি বৃহৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা বানিয়াচঙ্গের "হাবিলি" নামে পরিচিত। উত্তর দিকে খাসিয়া আক্রমণ নিবারণের জন্য গোবিন্দ খাঁ বা হবিব খাঁর পৌত্র আনওয়ার খাঁ ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে প্রায় ৫০০ সৈন্য থাকিতে পারিত। আনওয়ার খাঁ মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট হইতে দেওয়ান উপাধি পান। তখন হইতে বানিয়াচঙ্গের অধিপতিরা দেওয়ান-উপাধিতে পরিচিত।

এই বংশের দেওয়ান উমেদরাজার সময়ে লাউড় রাজ্য তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। উমেদরাজা অত্যন্ত দানশীল ও জনহিতৈষী ছিলেন ; এখনও পর্য্যন্ত এ অঞ্চলের কৃষকেরা বিপদে আপদে দেওয়ান উমেদ রাজার "দোহাই" দিয়া থাকে। দেওয়ান উমেদ রাজার পুত্র দেওয়ান আলমরাজা সরল প্রকৃতি এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে নানারূপ গল্প শুনা যায়। এখনও বোকা এবং অপব্যয়ী লোককে এ অঞ্চলে "আলম বেচেপা" আখ্যা দেওয়া হয়।

বাণিয়াচঙ্গের মকরন্দ রায় ও নরনারায়ণ ভট্ট ব্রজবুলিতে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। এখনও স্থানীয় লোকে এই সকল কবিতা আগ্রহের সহিত শোনে।

সাতগাঁও—আখাউড়া জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। স্টেশনের উত্তরেই সাতগাঁও ও বিষগাঁয়ের পাহাড়ে অনেক চা বাগান আছে। এই স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্ম্মাই দীঘি নামে একটি সরোবর ও নির্ম্মাই শিব বা বাণেশ্বর শিব নামক একটি শিবমন্দির আছে। এখানে বারুণী, শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীর সময় মহামেলা হয়।

নির্ম্মাই ও হির্ম্মাই নামক দুইজন রূপবতী ত্রিপুর রাজকুমারী পিতার নির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। কথিত আছে, খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতকে তাঁহারা দুই ভগিনী শ্রীহট্ট জেলার বলিশিরা পর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন ও এই শিবমন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি অতি সুরম্য। বারুণী ও অশোকাষ্টমীতে বহুলোক শিব দর্শনে আসেন। বলিশিরা বা বড়শীজোড়া পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২২ মাইল ও প্রস্থে ৪ মাইল। ইহার শৃঙ্গের নাম চূড়ামণি টিলা এবং উহা ৭০০ ফুট উচ্চ। এই পাহাড়েও অনেক চা বাগান আছে।

শ্রীমঙ্গল—আখাউড়া জংশন হইতে ৫৫ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান। এখানে বহু মহাজনের আড়ত ও ব্যাঙ্ক আছে।

এখানে নামিয়া শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম মহকুমা মৌলবীবাজার যাইতে হয়। স্টেশনে মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। শ্রীমঙ্গল স্টেশন হইতে মৌলবীবাজার ১৪ মাইল পথ। মৌলবীবাজার শহর মনু নামক নদীর তীরে অবস্থিত।

মৌলবীবাজারের নিকটে ষাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড় নামে একটি পাহাড় এবং হাইল হাওর নামে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। পাহাড়ের আকৃতি বৃষের ককুদের মত বলিয়া "ষাঁড়ের গজ" নাম হইয়াছে। ইহা উচ্চতায় ১১০০ ফুট।

ভানুগাছ—আখাউড়া জংশন হইতে ৬২ মাইল। পূর্ব্বে ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ইটা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিমদেশ হইতে আগত নিধিপতি নামক এক ব্যক্তি এই রাজ্যের স্থাপয়িতা বলিয়া কথিত। নিধিপতি "ভূমিউড়া-এও-লাতলি" গ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার "সপ্তপার দীঘি" এখনও তথায় বর্ত্তমান। কিংবদন্তী নিধিপতি পশ্চিমের ইটোয়া বা ইটা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম ইটা রাখেন। এই বংশে শুভরাজ খাঁ ইরাণী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং দীঘি খনন প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে খাঁ উপাধি লাভ করেন। তিনি ভানুগাছ হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান পাচগাঁওএর দক্ষিণে ও এওলাতলির পূর্ব্বদিকে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থান এখনও রাজখলা বলিয়া পরিচিত এবং তথায় শুভরাজ খাঁ বা সুরাজ খাঁর দীঘি নামে খ্যাত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীঘি এখনও বর্ত্তমান। শুভরাজ খাঁর পুত্র ভানুনারায়ণ বল বিক্রমে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন সামন্তরাজা চন্দ্রসিংহ বিদ্রোহী হইলে ভানুনারায়ণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী অবস্থায় ত্রিপুরাধিপতির নিকট অর্পণ করেন। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ভানুনারায়ণকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূমির কিছু অংশ তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই ভূমিখণ্ড তাঁহারই নামানুসারে ভানুকচ্ছ বা ভানুকাছ ও অধুনা ভানুগাছ নামে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভানুনারায়ণই ইটার প্রথম রাজা। তিনি এওলাতলি ও পাঁচগাঁওএর ৪।৫ মাইল দক্ষিণে রাজনগর নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

ভানুনারায়ণের পুত্র রাজা সুবিদনারায়ণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী শাসক ছিলেন। রাজনগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সাগর দীঘির" মত বড় দীঘি শ্রীহট্ট জেলায় বেশী নাই। সুবিদনারায়ণের প্রথমা কন্যা রত্নাবতী খঞ্জা ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতির বিবাহ হয়। এই বিবাহে রঘুপতির মাতার অমত থাকায় তিনি কনিষ্ঠ পুত্র বালক রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপ চলিয়া যান। অনেকে বলিয়া থাকেন এই রঘুনাথই নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি। রাজা সুবিদনারায়ণের সহিত শ্রীহট্টের দেওয়ান আনন্দ নারায়ণের মনোমালিন্য ঘটে এবং তাঁহার প্ররোচনায় দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় খোয়াজ ওসমান রাজনগর আক্রমণ করেন। শত্রুপক্ষ রাজবাটি অবরোধ করে। ভীষণ যুদ্ধে সুবিদনারায়ণ বীরের ন্যায় নিহত হন। রাণী কমলাসুন্দরী সহমরণে যান এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী ভানুমতী বিষপান করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন। রাজপুত্রগণ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। তথায় তাঁহারা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ইটায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃ সম্পত্তির বহু অংশ ফিরাইয়া পান।

টিলাগাঁও—আখাউড়া জংশন হইতে ৭২ মাইল দূর। টিলাগাঁও হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে শ্রীহট্ট জেলার সীমানার বাহিরে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে ঊনকোটি তীর্থ

অবস্থিত। এই স্থানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। উনকোটি পাহাড়ের চূড়ায় কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি এবং পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে কতকগুলি খোদাই করা মূর্ত্তি বর্ত্তমান। পর্ব্বত গাত্র ধসিয়া পড়ায় অনেক মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খোদাই করা মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি সুবৃহৎ মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মূর্ত্তিটি এত বড় যে ইহার কান দুটি কপাটের ন্যায় এবং কানের কুণ্ডল দুখানি চালের ন্যায়। গোঁফের এক দিক ভগ্ন এবং অপর দিক প্রায় দেড় হাত পরিমিত হইবে। মূর্ত্তির হাতে ত্রিশূল ও সম্মুখে দুটি প্রকাণ্ড বৃষ বর্ত্তমান। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই তীর্থ কালাপাহাড়ের হাতে লাঞ্ছিত হয় বলিয়া কথিত। এখন আর এই তীর্থে কোনও পূজার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এককালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল। রাজমালা পাঠে জানা যায় ত্রিপুররাজ বিজয়মাণিক্য উনকোটি দর্শনে গিয়াছিলেন। ইহা ত্রিপুর রাজবংশের কীর্ত্তি।

কৈলাসহর—উনকোটি তীর্থ হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে। ইহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র শহর। কাতলের দীঘি নামক একটি দীঘি ঘিরিয়া এই শহরটি অবস্থিত। বর্ত্তমান কৈলা সহরের ৪ মাইল উত্তরে ত্রিপুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসগড় অবস্থিত ছিল; এই স্থান এখন জঙ্গলাবৃত। ভগ্ন রাজবাড়ীর দক্ষিণদিক দিয়া প্রাচীন রাজসড়ক হাকালুকি হাওর পর্য্যন্ত গিয়াছে। নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী আজও "রাজার দীঘি" নামে খ্যাত। রাজসড়কের পূর্ব্বদিকে দুইটি মাটির স্তূপের চিহ্ন "কামান দাগার জান" নামে পরিচিত। কাতলদীঘি সম্বন্ধে গল্প আছে যে কাতল ও কাকচান্দ দুই ভাই একবার কার্য্য ব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছিলেন। কাতলের প্রচুর নগদ টাকা ছিল আর কাকচান্দের ছিল গোলা ভরা ধান। দুই ভাই যখন বিদেশে তখন দেশে ভীষণ অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কাতলের স্ত্রীর হাতে নগদ টাকা থাকিলেও ধান ও চাউলের অভাবে তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হয়। কাকচান্দের স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিয়া তিনি বিফল ও তিরস্কৃত হইলেন। শেষে উপবাস ও অনশনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কাতল ঘরে ফিরিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং দুঃখে কাতর হইয়া সমস্ত নগদ টাকা সমেত এই দীঘিতে ডুবিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। কিছুকাল পরে কাকচান্দ ফিরিয়া সমস্ত কথাই শুনিলেন এবং তাঁহার গোলাভরা ধান থাকিতে এইরূপ ঘটনা ঘটায় ক্ষুব্ধ হইয়া গোলা ভাঙ্গিয়া সমস্ত ধান দীঘির জলে ফেলিয়া দিলেন এবং নিজে উহার জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কুলাউড়া জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। কুলাউড়া শ্রীহট্ট জেলার একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ভট্টপাঠক ও ফেঞ্চুগঞ্জ হইয়া ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী সিলেট বাজার বা শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ভট্টপাঠক—কুলাউড়া জংশন হইতে ৯ মাইল। ইহার চলিত নাম ভাটেরা। এখানকার হোমের টিলায় আট ফুট নীচে মাটি হইতে বহু প্রাচীন কালের রাজা কেশব দেব ও তৎপুত্র ঈশান দেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে একটি রাজবংশের ও পাঁচজন রাজার গুণকীর্ত্তি লিখিত আছে।

ভাটেরার প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্বে হাকালুকি নামক সুবৃহৎ হাওর অবস্থিত।

ফেঞ্চুগঞ্জ—কুলাউড়া জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহা কুশিয়ারা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান।

সিলেট বাজার—কুলাউড়া জংশন হইতে ৩০ মাইল। সিলেট বা শ্রীহট্ট শহরটি সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে মুরারিচাঁদ কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, চারটি হাই স্কুল, একটি সংস্কৃত কলেজ, একটি বড় মাদ্রাসা, একটি মেডিক্যাল স্কুল ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। শ্রীহট্ট অতি পুরাতন স্থান। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্রীহট্ট জেলায় প্রাচীনকালে তিনটি প্রধান খণ্ডরাজ্য ছিল, যথা—

১ গৌড়, বাংলার প্রসিদ্ধ গৌড়ের নামানুসারে এই রাজ্যটি শ্রীহট্ট শহরকে ঘিরিয়া বহুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল এবং গৌড়ের রাজাই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান।

২ লাউড়, গৌড়ের পশ্চিমে এবং শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া।

৩ জয়ন্তীয়া ; শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া ; ইহা ছাড়া পার্ব্বত্য জয়ন্তীয়াও এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এই তিনটি ছাড়া পূর্ব্বে উল্লিখিত তরফ ও ইটা নামক দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত অপর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতাপগড় মুসলমান আমলে গৌড়ের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে গৌড়-গোবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের রাজাদের সাধারণ উপাধি "গোবিন্দ" ছিল। যাহা হউক কিংবদন্তী অনুসারে গৌড়-গোবিন্দ সমুদ্রের সন্তান। বর্ত্তমান শ্রীহট্ট শহরের গড়দুয়ার পল্লীতে গৌড়-গোবিন্দের দুর্গ ছিল বলিয়া কথিত এবং তথায় রাজবাটীর ভগ্নাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। শহরের অন্তর্গত "মনারায়ের টিলা" ও "টিলাগড়েও" গৌড়-গোবিন্দের গড় ছিল বলিয়া কথিত।

রাজা গৌড়-গোবিন্দের সময়ে "চক্রদত্ত" গ্রন্থপ্রণেতা, সুশ্রুতের টীকাকার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। রাজা গৌড়-গোবিন্দের উদরে কঠিন পীড়া হইলে যখন স্থানীয় চিকিৎসকগণ কোনই উপশম করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি চক্রপাণি দত্তকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জরাগ্রস্ত চিকিৎসক সেই বয়সে গঙ্গাকূল ছাড়িয়া গঙ্গাহীন শ্রীহট্টে আসিতে রাজী হইলেন না। রাণী তখন তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যের নিকট পাঠাইয়া নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন যে কবিরাজ মহাশয় যখন আসিলেন না, মহারাজের আরোগ্যের তখন কোনই আশা নাই। এ অলঙ্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই, তিনি তাহা আর পরিবেন না এবং তিনি রাজার অনুগামী হইবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। এই বার্ত্তা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া চক্রপাণি দত্ত পুত্রগণসহ শ্রীহট্টে আসিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রাজা আরোগ্য লাভ করিলে পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ তিনি পুনরায় গঙ্গাতীরে স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপর দুই পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ শ্রীহট্টে রহিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহু ভূসম্পত্তি দিয়া সম্মান করিলেন।

গৌড়-গোবিন্দ প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তাঁহার নানারূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যথা, শুধু শব্দ শুনিয়া দূর হইতে লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেন। এই সকল কারণে তাঁহার যাদুবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

কথিত আছে, গৌড়-গোবিন্দের রাজত্বকালে শ্রীহট্টের থুলটিকর নিবাসী বুরহানউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি পুত্রজন্মোপলক্ষে গোহত্যা করেন; দুর্ভাগ্যক্রমে একটি চিল একখণ্ড মাংস রাজগৃহে নিক্ষেপ করে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বুরহান উদ্দীনের হাত কাটিয়া লেন ও তাঁহার শিশুপুত্রকে নিহত করেন। এই সময়ে তরফেও গোবধের জন্য নুর উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি নিহত হন বলিয়া কথিত। বুরহান উদ্দীন প্রতিশোধের জন্য সুবর্ণগ্রামের রাজা প্রতাপশালী শামস্ উদ্দীন ইলিয়াস খাঁজের শরণ লইলেন; তিনি এক দল সৈন্য গৌড়-গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তখন বুরহান উদ্দীন ও নুর উদ্দীনের ভ্রাতা দিল্লী গিয়া তোগলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। সম্রাট নিজ ভাগিনেয় সিকন্দর শাহ গাজীর অধীনে একদল সৈন্য গৌড়-গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বর্ষাগমে শ্রীহট্টে পৌঁছাইলে এই সৈন্যদল পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা ভয় পাইয়া মনে করে ইহা গৌড়-গোবিন্দের যাদুবিদ্যার কাজ। সিকন্দর আর একদল সৈন্য আনিলে তাহারাও গৌড়-গোবিন্দের যাদুবিদ্যার প্রভাব শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িল। সম্রাট্ ভাগিনেয় তখন শ্রীহট্ট জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন। বুরহান উদ্দীন বিষন্ন মনে দেশ ত্যাগ করিয়া মদিনা যাইবার পথে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহজলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বুরহান উদ্দীনের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া হজরত শাহজলাল ইহার প্রতীকারকল্পে বুরহান উদ্দীনের সহিত নিজ দলবল লইয়া শ্রীহট্টের দিকে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে সম্রাট সিকন্দর সাহের পরাজয়ের কথা শুনিয়া বোগদাদ হইতে আগত নসীরুদ্দীন নামক একজন পীরকে সিপাই সালার বা সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে এলাহাবাদে উভয়দলের সাক্ষাৎ হইল, পরাজিত সিকন্দার গাজীও এইখানে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিলেন। পীর নসীরউদ্দীন সিপাই সালার ও সিকন্দর গাজী হজরত শাহজলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সম্মিলিত দল ব্রহ্মপুত্র তীরে পৌঁছাইলে তাঁহারা যাহাতে পার হইতে না পারেন সেই জন্য গৌড়-গোবিন্দ নৌকা চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। কথিত আছে শাহজলালের অলৌকিক ক্ষমতা বলে দলের সকলে নমাজ পড়িবার জন্য ব্যবহৃত নিজ নিজ চর্ম্মাসন জলে ভাসাইয়া তাহা ধরিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। গৌড়-গোবিন্দ জানিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া তাঁহারা পার হইলেন। হবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দিনাজপুর পরগণার অবস্থিত চৌকি নামক স্থানে শত্রুপক্ষকে বাধা দিবার জন্য গৌড়-গোবিন্দ অগ্নিবাণ প্রয়োগ প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু ইহাতে বিফল হইয়া তিনি বরাক নদীর খেয়া বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু শাহজলালের প্রভাবে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার দল অনায়াসে নদী পার হইতে সক্ষম হন; এই উপায়ে তাঁহারা সুরমা নদীও পার হইলেন। অনায়াসেই শ্রীহট্ট বিজিত হইল এবং গৌড়-গোবিন্দ পলায়ন করিলেন। ইনিই শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা। শাহজলাল সম্রাট-ভাগিনেয় সিকন্দর গাজীর উপর শ্রীহট্টের শাসন ভার অর্পণ করিলেন।

হজরত মহম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, শাহজলাল সেই কুরেশী বংশীয় এবং হজরত মহম্মদ হইতে গুরু পরম্পরায় অষ্টাদশ স্থানীয়। "এমন" তাঁহার জন্মভূমি। শৈশবে মাতাপিতা হারাইয়া তিনি তাঁহার মাতুল সাধক সৈয়দ আহম্মদ কবীরের নিকট মক্কাতে অবস্থান করিতেন। বয়োপ্রাপ্তি হইলে মাতুলের নিকট তিনি ধর্ম্মসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে একদিন একটি হরিণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীত হইয়া কবীরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। শাহজলাল চপেটাঘাতে ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া হরিণকে আশ্রয় দিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতুল

ডামচেরার নিকটবর্ত্তী একটি পার্ব্বত্যনদীর দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৯২)

হাফ্‌লং দুর্গ (পৃষ্ঠা ১৯৩)

বুঝিলেন যে তাঁহার ভাগিনেয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁহারই সমান হইয়াছেন। তখন ধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহাকে হিন্দুস্থানের দিকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রস্থানের সময়ে নিজ সাধনার স্থান হইতে এক মুঠা মাটি শাহজলালের হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন যে ইহা যত্নে রাখিবে এবং যাহাতে ইহার বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বিকৃত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং যে স্থানে ঠিক এইরূপ মাটি পাওয়া যাইবে সেইখানে ইহা ছড়াইয়া দিয়া বাস করিবে। শাহজলাল এই মাটি যত্নের সহিত লইয়া বার জন শিষ্যসহ হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একজন শিষ্যের কাজ হইল পথে যাইতে যাইতে নানাস্থানের মাটি আস্বাদ করিয়া পরীক্ষা করা। এই ব্যক্তির নাম হইল চাস্‌নি পীর। শাহজলাল প্রথমে জন্মস্থান এমন-এ যাইলেন। কথিত আছে এমনের রাজা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিষ মিশ্রিত শরবৎ পান করিতে দেন। শাহজলাল রাজার মতলব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ফকিরের পক্ষে ইহা অমৃত কিন্তু দাতার পক্ষে বিষ।" এই বলিয়া শরবৎ পান করিলেন। এদিকে রাজা হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুত্র শেখ আলি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শাহজলালের সঙ্গ লইলেন। পথে শিষ্য সংখ্যা বাড়িতেই লাগিল। শ্রীহট্ট শহরে যখন পৌঁছিলেন তখন তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ৩৬০ জন হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যে শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীহট্ট "তিন শ ষাট আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া পরিচিত।

শ্রীহট্টের মাটি পরীক্ষা করিয়া চাস্‌নিপীর দেখিলেন ইহা বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে পীর আহম্মদ রুবীর প্রদত্ত মাটির সমতুল্য। শাহজলালকে ইহা জানাইলে তিনি বুঝিলেন এই স্থানই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। শাহজলাল একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। নিকটস্থ নানাস্থানে তাহার সঙ্গী পীরগণকে পাঠাইয়া মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীহট্টে ৩০ বৎসর বাসের পর বাষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মসজিদের পাশেই দেহ সমাহিত করা হয়। শাহজলালের দরগাহ হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই মান্য এবং ইহার জন্যই শ্রীহট্ট শহর একটি প্রধান মুসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। সরকার এই দরগার জন্য মাসিক একশত টাকা ব্যয়ভার বহন করেন।

শাহজলালের দরগাহে কতকগুলি প্রস্তর লিপি আছে। ইহার বৃহৎ মসজিদটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শাহজলাল কর্ত্তৃক আনীত একটি উট পাখীর ডিম, তাঁহার "জুলফিকার" নামক তলোয়ার, কাষ্ঠপাদুকা, নমাজের মোসল্লা বা চর্ম্মাসন বহু যত্নে দরগাহে রক্ষিত হইয়াছে। দরগাহে একটি বৃহৎ তাঁমার ডেগ আছে, উহাতে ১০।১২ মণ চাউলের অন্ন পাক করা যায়; ইহার গাত্রে যে ইরাণী কবিতা লিখিত আছে তাহাতে ১১১৫ হিজরী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে। কথিত আছে যে ইহা আওরঙ্গজেব প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দরগাহে শাহজলালের সমাধি ব্যতীত এমন-রাজকুমার শাহাজাদা শেখ আলি প্রভৃতি আরও অনেকের সমাধি আছে। শাহজলালের অনুচরবর্গের অনেকের সমাধি শ্রীহট্ট শহরে অবস্থিত। শহরের গোয়াইপাড়ায় চাসনি পীরের কবর।

সম্রাট আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্ট শাসনের ভার আমিল উপাধিধারী কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। সাধারণে ইহাদের নবাব বলিত। আমিলদের শাসনকাল সাধারণতঃ অল্প ছিল। হরকৃষ্ণ নামক একজন হিন্দুও আমিলপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি নবাব হরকিষণ দাস মনসুর-উল-মুলক বাহাদুর নামে পরিচিত হন। হরকৃষ্ণের শাসনকাল অতি অল্প হইলেও তিনি সেই

অল্পকালের মধ্যে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। হরকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী পদচ্যুত আমিলের প্ররোচনায় গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লী হইতে নূতন আমিল নিযুক্ত হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই এক বৎসর শ্রীহট্টের শাসন কার্য্যে নায়েব ফৌজদার সাদেকউল্লা, সেনাধ্যক্ষ হরদয়াল ও দেওয়ান মাণিকচাঁদ একত্র এই তিন জনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের যুক্ত শাসনের মোহরে তিন জনের নামের আদ্যাংশ লইয়া "সাদেকুল হরমাণিক" লিখিত ছিল।

এই শহরের যুগলটিলার বৈষ্ণব আখড়া ও দুর্গাবাড়ী বিশেষ বিখ্যাত।

পীঠমালা তন্ত্রপাঠে জানা যায় যে সতীদেহের গ্রীবা ও বাম জঙ্ঘা শ্রীভূমি বা শ্রীহট্টে পতিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট শহর হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটিকর জৈনপুর নামক পল্লীতে গ্রীবাপীঠ অবস্থিত। এখানে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সর্ব্বানন্দ। শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীর সময়ে এখানে মেলা হয়।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ শ্রীহট্ট শহর হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যের অন্তর্গত বাউরভাগ বা ফালজোর নামক গ্রামে একটি পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

ইহা সাধারণ্যে ফালজোরের কালীবাড়ী বলিয়া পরিচিত। এখানে দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর। প্রস্তরময়ী দেবীর সহিত ভৈরব অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থিত। শ্রীহট্ট হইতে বর্ষাকালে স্টীমারে ও অন্যান্য ঋতুতে নৌকায় কানাইর ঘাট পৌছিয়া তথা হইতে পদব্রজে ৫ মাইল পথ গেলে এই মহাপীঠে পৌছানো যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তীর্থে বহু নরবলি হইয়া গিয়াছে। জয়ন্তীয়া রাজ্য ইংরেজের অধীনে আসিলে এই প্রথা বন্ধ হয়।

পূর্ব্বে এই মহাপীঠ অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে জয়ন্তীয়ার বড় গোসাইএর রাজত্ব কালে এই মহাপীঠের প্রকাশ হয়। একদা এক দল রাখাল বালক একটি শিলাখণ্ড লইয়া পূজা পূজা খেলিতেছিল। একজন পূজারী হইল, একজন ছাগল হইল, একজন ঘাতক ইত্যাদি। পূজান্তে ছাগরূপী বালককে বলি দিবার সময় খড়্গের স্থলে তৃণ দিয়া আঘাত করিলে বালকটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। বালকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। এই ব্যাপার শুনিয়া জয়ন্তীয়া রাজের গুরু আধ্যাত্মিক প্রমাণ পাইয়া ও শাস্ত্রালোচনার দ্বারা স্থির করেন যে এই শিলাখণ্ডই বামজঙ্ঘা মহাপীঠ বা জয়ন্তী দেবীর প্রতিকৃতি। এখানে সতীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়। বামজঙ্ঘা হইতে বামউরুভাগ ও তাহা হইতে বাউরভাগ নাম হইয়াছে।

বাউরভাগ হইতে দুই মাইল দূরে একটি পর্ব্বতের উপর রূপনাথ শিব ও রূপনাথ গুহা অবস্থিত। এই অন্ধকারাবৃত গুহার মধ্যে বহু স্বাভাবিক শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পর্ব্বতগাত্রে সতত জলবিন্দু সঞ্চিত থাকে। তাহার উপর আলোক সম্পাত হইলেই মনে হয় যেন শত শত নক্ষত্র শোভা পাইতেছে। ইহাকে "নক্ষত্র মণ্ডল" বলে। এই গুহার মধ্যে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিশূল প্রথিত আছে। উহা মহাকালের ত্রিশূল নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে অসুরগণের ভয়ে ভীত দেবগণ এই গুহার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন। রূপনাথ গুহার নিকটে "সাত হাত পানি," "গুপ্তগঙ্গা" ও "পাতালগঙ্গা" নামক অপর কয়েকটি তীর্থ আছে। "সাত হাত পানি" একটি

কুণ্ড বিশেষ। ইহাতে সাত হাতের বেশী জল কখনও থাকে না। এখানে সর্ব্ব তীর্থের সমাবেশ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পর্ব্বত গাত্র হইতে নিঃসৃত একটি জলধারার নাম গুপ্তগঙ্গা। এই জলধারাটি যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে রূপনাথ শিবের অভিষেকের জন্য গঙ্গা গুপ্ত ভাবে এই ধারার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছেন। নিকটস্থ অনুরূপ একটি কুণ্ডের নাম পাতালগঙ্গা। এই স্থানে শিবরাত্রি ও বারুণীর সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

রূপনাথ শিবের দক্ষিণে একটি জলাশয়ের ধারে কাল পাথরের একটি প্রকাণ্ড হস্তী মূর্ত্তি আছে। দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন জীবন্ত বন্য হস্তী জল পানের জন্য আসিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলা চৈতন্য-যুগের বহু বৈষ্ণব ভক্তের জন্মভূমি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীহট্ট হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে "ঢাকা দক্ষিণ" দত্তরাইল নামক গ্রামে চৈতন্য দেবের জনক জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। এখানে মহা-প্রভুর মন্দির আছে। ইহা ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে দুইটি মূর্ত্তি দিয়া যান বলিয়া কথিত। একটি নিজের এবং অপরটি কৃষ্ণমূর্ত্তি। দুটি মূর্ত্তিই ঠাকুর বাড়ীতে পূজিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। ঢাকা দক্ষিণে কৈলাস নামক ছোট একটি পাহাড়ে গোপেশ্বর শিব আছেন।

শ্রীহট্ট হইতে স্টীমারে করিয়া এই জেলার প্রাচীন লাউড়ের অন্তর্গত অন্যতম মহকুমা সুনামগঞ্জে যাইতে হয়। শ্রীহট্ট হইতে সুনামগঞ্জ নদীপথে ৬৫ মাইল দূর। স্টীমারে প্রায় ৯ ঘণ্টা সময় লাগে। সুনামগঞ্জ হইতে প্রাচীন লাউড় রাজ্যের অন্তর্গত নবগ্রামের পণাতীর্থে যাওয়া যায়। নবগ্রাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্য্যের জন্মস্থান। স্বীয় জননীর স্নানের জন্য অদ্বৈত আচার্য্য শক্তিবলে লাউড় পাহাড়ের উপর সমগ্র তীর্থের সমাবেশ করেন। তীর্থগণ বৎসরের মধ্যে একদিন লাউড়ে আসিবার জন্য পণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম পণাতীর্থ। এই তীর্থটি একটি ঝরণা। ঈশান নাগর কৃত "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে পণাতীর্থের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বারুণীর সময়ে এখানে বিস্তর জন সমাগম হয়।

লাউড়ে প্রাচীন কালে ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত। দৈবশক্তি সম্পন্ন দ্রুতগামী হস্তী পৃষ্ঠে তিনি রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই কামরূপ রাজ ভগদত্ত। লাউড় কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে শ্রীহট্ট-শিলং মোটর রাস্তার উপর জয়ন্তীয়াপুর অবস্থিত। এখানে জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। জয়ন্তীয়ারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়ন্তেশ্বরী নামক এক কালীমন্দির এখানে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এই কালীর নিকট নরবলি দেওয়া হইত। এখনও প্রতি অমাবস্যা তিথিতে বহু লোক এখানে পূজা দিতে আসে।

লাতু—আখাউড়া জংশন হইতে ৫৪ মাইল।০ স্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গ্রামে বাসুদেবের মন্দির বিদ্যমান। এক খণ্ড কালো পাথরে তিনটি সুন্দর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।

মধ্যে বাসুদেব ও দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি। বাসুদেবের নাম হইতে স্থানটিকে বাসুদেবপুর বলা হয়।

করিমগঞ্জ জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ১২১ মাইল দূর। ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটি মহকুমা ও বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। শহরটি কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে তিনটি হাই স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে।

এই মহকুমায় অনেক চা-বাগান আছে।

করিমগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ৩১ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্ল্লভছড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই শাখাপথের বাইগ্রাম জংশন হইতে অপর একটি শাখা ৮ মাইল দূরবর্ত্তী কলকলিঘাটে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই শাখা রেলপথ দুটি শ্রীহট্টের প্রাচীন খণ্ডরাজ্য প্রতাপগড়ে অবস্থিত। পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ জঙ্গল মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই রাজবাড়ী পাথরের কারুকার্য্যে সুশোভিত ছিল। আদম আইল ও দু-আলিয়া নামক দুইটি পর্ব্বত শ্রেণী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে।

বদরপুর জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ১২৮ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জংশন ও বাণিজ্য প্রধান স্থান। বদরপুর বন্দর বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার শেষ সীমানা। বরাক নদীর উপরকার রেলওয়ে সেতুটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। আসাম বাংলা রেলপথের পার্ব্বত্য বিভাগ এখান হইতে বাহির হইয়াছে। ষ্টেশনের অনতিদূরে বরাক নদীর ধারে সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। এই শিব কপিল মুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। বায়ুপুরাণমতে এই স্থানের নাম কপিলতীর্থ এবং কপিল মুনি এই স্থানেই তপস্যা করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণে বরাক বা বরচক্র নদের মাহাত্ম্যও লিখিত হইয়াছে। বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং বহু লোক স্নানার্থে আসিয়া থাকেন।

বরাক নদীর অপর পার হইতে কাছাড় জেলার সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। কাছাড় শব্দটি নেপালী ভাষার শব্দ। উহার অর্থ "প্রান্তদেশ"। এই জেলার দক্ষিণাংশ সমতল। এই অংশে প্রধানতঃ বাঙালীর বাস। জেলার উত্তরাংশ পর্ব্বতবহুল ও জনবিরল। এই বিভাগে নাগা, কুকী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বাস। শ্রীহট্টের ন্যায় কাছাড় জেলায়ও বিস্তর চা-বাগান আছে।

কাছাড়ের প্রাচীন নাম হৈড়ম্ব প্রদেশ। পূর্ব্বে এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। উক্ত রাজবংশীয়গণ হিড়িম্বা ও ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ত্রিপুরা রাজপরিবারের সহিত এই রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই রাজবংশের প্রাচীন কীর্ত্তি মাইবং নামক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মাইবং ষ্টেশনটি বদরপুর-লামডিং বা পার্ব্বত্য বিভাগে অবস্থিত। বদরপুর জংশন হইতে ইহার দূরত্ব ১৪৯ মাইল। এই পথে বদরপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূরবর্ত্তী জাটিঙ্গা একটি মনোরম স্থান। ইহার চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। আহোম ও নাগাগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মাইবং আসিবার পূর্ব্বে কাছাড়ী

রাজাদের রাজধানী ছিল ডিমাপুরে। ইহা পাণ্ডু-তিনসুকিয়া লাইনের মণিপুর রোড ষ্টেশনের নিকটেই অবস্থিত ছিল। ইহার বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য বা উত্তর কাছাড়ের মহকুমা দপ্তর ৩১১৭ ফুট উচ্চ হাফ্‌লং শৃঙ্গ। এই ষ্টেশন বদরপুর জংশন হইতে ৮৭ মাইল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানে একটি অতি সুন্দর হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটাখাল—বদরপুর জংশন-শিলচর শাখা লাইনে অবস্থিত এবং আখাউড়া জংশন হইতে ১১৫ মাইল। এখান হইতে একটি শাখা লাইন কাছাড় জেলার অন্যতম মহকুমা হাইলাকান্দি হইয়া ২২ মাইল দূরবর্ত্তী লালাঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। হাইলাকান্দি মহকুমায় বহু চা-বাগান আছে।

শিলচর—আখাউড়া ও বদরপুর জংশন হইতে যথাক্রমে ১৪৬ ও ১৮ মাইল। ইহা কাছাড় জেলার সদর। বরাক নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুপম। অনতিদূরে উত্তর কাছাড়ের দৃশ্য সুন্দর।

মাইবং হইতে কাছাড়ী রাজাদের রাজধানী শিলচরের ১০ মাইল উত্তরে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রণচণ্ডী দেবীর মন্দির এখনও এখানে বিদ্যমান আছে।

শিলচর হইতে মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল ও লুসাই-পাহাড় জেলার প্রধান শহর আইজলে যাওয়া যায়।

শিলচর হইতে ইম্ফলের দূরত্ব ১২৫ মাইল। ইহার মধ্যে কতকটা পথ মোটর গাড়ীতে ও মধ্যবর্ত্তী কতকটা পথ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হয়। পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে রেষ্ট হাউস্ বা বিশ্রামাগার আছে। এই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

মণিপুর একটি করদ রাজ্য। মণিপুররাজ ইংরেজ সরকারকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। এই রাজবংশ অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া খ্যাত। মণিপুর রাজ্যে লোগটক্ নামে অতি সুন্দর একটি হ্রদ আছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল এবং বিস্তারে ৫ মাইল। ইম্ফল হইতে উহা ৩০ মাইল দূর। এই হ্রদটি দেখিবার জন্য বহু ভ্রমণকারী মণিপুর যাইয়া থাকেন। মোটরবাসে এই হ্রদে যাওয়া যায়। মণিপুরের অধিবাসিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত। প্রাচ্য নৃত্যকলায় মণিপুরী নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মণিপুরের রাসলীলা ও দোলযাত্রা উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। প্রবাদ যে জগদ্বিখ্যাত "পোলো" খেলার উৎপত্তি মণিপুর হইতে হইয়াছে।

শিলচর হইতে আইজলের দূরত্ব ১১১ মাইল। এই পথে আটটি সুসজ্জিত বিশ্রামাগার আছে। শিলচর হইতে দোয়ারবাঁধ পর্য্যন্ত প্রথম ১৮ মাইল পথ গো-যানে যাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী পথ অশ্বারোহণে যাইতে হয়। শিলচর হইতে নৌকাযোগেও আইজলে যাওয়া যায়। ইহাতে সাধারণতঃ ১৫ দিন সময় লাগে। লুসাই পাহাড়ের পাদদেশস্থ সাইরং নামক স্থান পর্য্যন্ত নৌকাযোগে গিয়া সেখান হইতে প্রায় ১৪ মাইল পথ গো-যানে যাইতে হয়। নৌকাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর।

উপসংহার

পাৰ্ব্বত্য বিভাগ বা বদরপুর-লাম্‌ডিং শাখা পার হইয়া আসাম-বাংলা রেলপথের প্রধান লাইন একদিকে তিনসুকিয়া ও অন্যদিকে গৌহাটি ও পাণ্ডু পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূভাগ বনজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। তিনসুকিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল কেরোসিন তৈল, পেট্রোল ও কয়লার জন্য বিখ্যাত। ভাষা ও বেশভূষার দিক দিয়া গারো, নাগা, মিকির ও কুকি প্রভৃতি পাৰ্ব্বত্য জাতি এই স্থানের বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে। বস্তুতঃ ভ্রমণকারীর পক্ষে আসাম-বাংলা রেলপথ তথা আসাম প্রদেশ অপূৰ্ব্ব বৈচিত্র্যের আধার।

বাংলায় ভ্রমণ

দ্বিতীয় খণ্ড

—স্থান-সূচী—

দ্রষ্টব্য:—কোন স্থানের পার্শ্বে একাধিক পত্রাঙ্ক থাকিলে উহা একই নামের বিভিন্ন স্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে।